বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
খণ্ড ৩৩ বার্ষিক সংখ্যা ১৪২২

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সুশাসনের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সেবার মান

এম এ মান্নান*

১। পটভূমি

স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাতে গত কয়েক বছরে বাংলাদেশ প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও টিকাদান কর্মসূচিতে বাংলাদেশের সফলতা উল্লেখযোগ্য। মাতৃমৃত্যু ও শিশু মৃত্যুর হারও এদেশে বিশেষভাবে হ্রাস পেয়েছে। ১৯৭৩ হতে ২০০৭ সময়কালে শিশু মৃত্যুর হার প্রতি ১০০০ জনে ১৫০ থেকে ক্রমান্বয়ে কমে ৪৭ এ দাঁড়িয়েছে। একই সময়ে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হারও প্রতি ১০০০ জনে ২৬০ থেকে কমে হয়েছে ৬১ জন। ১৯৭০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে গড় আয়ু যেখানে ছিল ৪৮ বছর, ২০১৫ সালে তা বেড়ে হয়েছে সত্তর বছর। সন্তান জন্মদানের প্রবণতাও উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে--১৯৭৩ সালের ৬.৩ থেকে কমে ২০১৫ সালে ২.৪-এ পৌঁছেছে, ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও বহুলাংশে কমেছে। ১৯৭০ সালে বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২.৯ শতাংশ, যা ২০১১ সালে ১.৩ শতাংশে নেমে এসেছে। এসব সফলতা সত্ত্বেও স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাতে এখনও অনেক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, সেগুলো দূর করা প্রয়োজন।

স্বাস্থ্য মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার এবং মানব উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। জাতিসংঘের "সার্বজনীন মানবাধিকার" ঘোষণার ২৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী স্বাস্থ্যরক্ষা ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তি জনগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার। "২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য সুস্বাস্থ্য" নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে ১৯৭৮ সালের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আলমা আতা ঘোষণায় (Alma Ata Declaration) বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেছিল, কিন্তু বাংলাদেশ আলমা-আতা ঘোষণায় প্রত্যাশিত সাফল্যের কাছাকাছি অদ্যাবধি পৌঁছুতে পারেনি।

পৃথিবীর অনেক উন্নয়নশীল দেশের চেয়ে বাংলাদেশের সরকারি স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবকাঠামো অনেক উন্নত। স্বাস্থ্যকেন্দ্র সমূহকে পাঁচ স্তরে ভাগ করা যায়: গ্রাম/ওয়ার্ড পর্যায়ে প্রতি ছয় হাজার লোকের জন্য আছে কমিউনিটি ক্লিনিক, প্রতিটি ইউনিয়নের জন্য ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, জেলা পর্যায়ে জেলা হাসপাতাল এবং সবশেষে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল/বিশেষায়িত হাসপাতাল। সেই সাথে রয়েছে পর্যাপ্ত মানব সম্পদ, হাজার হাজার ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী। কিন্তু স্বাস্থ্য খাতে বিপুল বিনিয়োগ সত্ত্বেও জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ এখনও সরকারি স্বাস্থ্যসেবার সুফল থেকে বঞ্চিত। নিয়ম অনুযায়ী সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা পাওয়ার কথা থাকলেও বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। সরকারি হাসপাতালে নানা অনিয়ম ও হয়রানির কারণে পল্লীর বিপুল জনগোষ্ঠী অসুখ-বিসুখে

---

* সিনিয়র রিসার্চ ফেলো (পিআরএল), বিআইডিএস। প্রবন্ধটি রিভিউ করে দেয়ার জন্য লেখক জনৈক রিভিউয়ারের নিকট কৃতজ্ঞ।

সাধারণত অপ্রশিক্ষিত চিকিৎসকের উপর নির্ভর করে। পল্লী এলাকার জনগণ অসুস্থ হলে সচরাচর গ্রাম্য ডাক্তার/চিকিৎসক, হাতুড়ে ডাক্তার, কবিরাজ-হোমিওপ্যাথের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হয়।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, ওষুধ ও অন্যান্য দ্রব্যাদির অপ্রতুলতা, নিয়ম বহির্ভূত অর্থ গ্রহণ ও সেবাদানকারীর অনুপস্থিতি স্বাস্থ্য সেবাদান কার্যক্রমকে অনেকাংশে বাধাগ্রস্ত করছে। স্বাস্থ্যসেবার ব্যয় এবং চিকিৎসা সেবার নিম্নমান দরিদ্র ও অসহায় জনগোষ্ঠীকেই বেশি প্রভাবিত করে। স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় বরাদ্দের সাথে সাথে স্বাস্থ্যকেন্দ্র ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়গুলোও তাই পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যে সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সেবার মান এবং ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়সমূহ পর্যালোচনার জন্য এশিয়া ফাউণ্ডেশনের অর্থায়নে বিআইডিএস কর্তৃক (২০১২-১৩ সালে) "বাংলাদেশে সরকারি খাতে প্রদত্ত সেবার মান নিরূপণ: প্রেক্ষাপট স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সুশাসন" শীর্ষক বর্তমান গবেষণা পরিচালিত হয় (বিআইডিএস, ২০১৩)। এ গবেষণার ফলাফলের উপর ভিত্তি করেই বর্তমান প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে।

২। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সেবার মান: তত্ত্বীয় গবেষণা/প্রকাশনাসমূহ

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিরাজমান কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় স্বাস্থ্য সেবায় সুশাসনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম পরিচালনায় দক্ষতার অভাব, ঔষধপত্র ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সামগ্রীর অপ্রতুল সরবরাহ,স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে জনবল, বিশেষ করে ডাক্তার-নার্সদের অনুপস্থিতি এবং রোগীর প্রতি অবজ্ঞা-অবহেলা, প্রদত্ত সেবার নিম্নমান এবং সর্বোপরি সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সেবা সম্পর্কে সাধারণ জনগণের মধ্যে বিদ্যমান নেতিবাচক ধারণা (negative perception) ।

চিকিৎসকের অনুপস্থিতি বিষয়ক পূর্বে সম্পাদিত বিভিন্ন সমীক্ষা থেকেও অনুরূপ তথ্য পাওয়া যায়, যেমন বিশ্ব ব্যাংক সমীক্ষা (ইউরো হেলথ/বিশ্ব ব্যাংক, ২০০৪), ভৌতিক ডাক্তার:স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অনুপস্থিতি (চৌধুরী ও হ্যামার ২০০৩) ইত্যাদি। ইউরো হেলথ/বিশ্ব ব্যাংক সমীক্ষা অনুযায়ী বাংলাদেশের হাসপাতালে অনুপস্থিতি বিষয়ে রোগীদের অধিকাংশের (৬১.৭ শতাংশ) মতে সময় মতো ডাক্তার পাওয়া যায় না, আবার ৫৪ শতাংশ রোগীর মতে হাসপাতাল স্টাফদের দৃষ্টিভঙ্গিও বৈরী। উপরের পরিসংখ্যান থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হাসপাতাল ব্যবস্থাপনায় যথেষ্ট দুর্বলতা বিদ্যমান, যার কারণে সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র সম্পর্কে সাধারণ জনগণের ধারণাও নেতিবাচক। গড়ে একজন রোগী দেখতে ডাক্তার সময় দিয়ে থাকেন ২ মিনিটের মতো। তবে এক-তৃতীয়াংশ রোগীর ক্ষেত্রে কনসালটেনশন সময় মাত্র এক মিনিট (ইউরো হেলথ/বিশ্ব ব্যাংক, ২০০৪) । এই সব নেতিবাচক কারণে সিয়েট কানাডা ও বাংলাদেশ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সমীক্ষা (২০০১) অনুযায়ী মাত্র শতকরা ১০ ভাগ রোগী সরকারি হাসপাতালে স্বাস্থ্য সেবার মান ভালো বলে মতামত দিয়েছেন।

নিয়মানুযায়ী সরকারি হাসপাতালে বিনা খরচে চিকিৎসা পাওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। টাকা ছাড়া সরকারি হাসপাতালে বাস্তবে কোনো চিকিৎসা পাওয়া যায় না। উল্লেখ্য, ১৯৮৭ সালে বিআইডিএস পরিচালিত এক সমীক্ষা অনুযায়ী গ্রামীণ এলাকায় সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ৩৬ শতাংশ রোগী টাকার বিনিময়ে চিকিৎসা সেবা নিয়েছেন আর শহর এলাকার হাসপাতালগুলোতে এ হার ৩২ শতাংশ (খান, ১৯৮৮)। বিগত দুই দশকে হাজার হাজার ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্য কর্মী সরকারি হাসপাতালে যোগ দেয়ার পরও নিয়ম বহির্ভূত খরচের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোনো অগ্রগতি সাধিত হয়নি। ইউরো হেলথ/বিশ্ব ব্যাংক এর সমীক্ষা (২০০৪) অনুযায়ী এক-চতুর্থাংশ (২৪ শতাংশ)

বহির্বিভাগ রোগী এবং দুই-তৃতীয়াংশ (৬৫ শতাংশ) আন্তবিভাগ রোগীকে নিয়ম বহির্ভূত খরচ করতে হয়েছে। যারা নিয়ম বহির্ভূত খরচ করেছেন তাদের মধ্যে ৬১ শতাংশ একবার, ৩২ শতাংশ দুইবার এবং বাকি ৭ শতাংশ কমপক্ষে তিনবার এ ধরনের খরচ করতে বাধ্য হয়েছেন।

যে সমস্ত রোগীকে নিয়ম বহির্ভূত খরচ করতে হয়েছে তাদের মধ্যে অধিকাংশকেই (প্রায় তিন-চতুর্থাংশ) বাড়তি অর্থ দিতে হয়েছে হাসপাতালের নন-মেডিকেল স্টাফদেরকে (ওয়ার্ড বয়, পিয়ন/সাপোর্ট স্টাফ) এবং ডাক্তার/নার্সদেও বেলায় খুব সামান্য সংখ্যকের ক্ষেত্রে এধরনের ব্যয় করতে হয়েছে। যে সব রোগীকে নিয়ম বহির্ভূত খরচ করতে হয়েছে তাদের মধ্যে শতকরা ৬০ জন বলেছেন পিয়ন/ওয়ার্ড বয়কে অতিরিক্ত টাকা দিতে হয়েছে এবং প্রায় ৫৭ শতাংশ বলেছেন কেরানী/প্রশাসনিক কর্মচারীদেরকে অর্থ প্রদান করতে হয়েছে। অন্যদিকে স্বল্প সংখ্যক রোগী ডাক্তার (১৩ শতাংশ) অথবা নার্সকে (১৪ শতাংশ) এ ধরনের বাড়তি টাকা (আন-অফিসিয়াল পেমেন্ট) দেয়ার কথা বলেছেন। সরকারি হাসপাতালে ভর্তি হতে একজন রোগীকে গড়ে ১৭ দিন অপেক্ষা করতে হয়েছে। শুধু তাই নয়, হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার জন্য শতকরা ১৯ ভাগ রোগীকে ঐ কেন্দ্রের ডাক্তারকে প্রাইভেটলি কনসাল্ট করতে হয়েছে এবং ৩৫ শতাংশ রোগী সংসদ সদস্য/আমলা/প্রভাবশালী ব্যক্তির সুপারিশে হাসপাতালে সিট পেয়েছেন (ইউরো হেলথ/বিশ্ব ব্যাংক, ২০০৪) ।

চিকিৎসা খাতে খরচের সিংহভাগই জনগণকে নিজের পকেটের অর্থ খরচ করে মেটাতে হয়। যেমন, বিশ্ব ব্যাংক (ইউরো হেলথ/বিশ্ব ব্যাংক, ২০০৪) সমীক্ষা অনুযায়ী বহির্বিভাগ রোগীদের ১২ শতাংশ এবং আন্তবিভাগ রোগীদের মাত্র ১ শতাংশ প্রয়োজনীয় ঔষধপত্রের পুরোটাই হাসপাতাল স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে পেয়েছে। পক্ষান্তরে এক-তৃতীয়াংশেরও অধিক বহির্বিভাগ (৩৬ শতাংশ) ও আন্তবিভাগ (৩৪ শতাংশ) রোগী হাসপাতাল থেকে কোনো ঔষধপত্রই পায়নি। তাই প্রয়োজনীয় ঔষধপত্রের চাহিদা মেটাতে দরিদ্র পরিবারের রোগীদের অনেক ভোগান্তি পোহাতে হয়।

৩। গবেষণার উদ্দেশ্য ও গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র/স্বাস্থ্যসেবা থেকে জনগণ প্রকৃতপক্ষে কতটুকু উপকৃত হচ্ছেন এবং স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কি ধরনের প্রতিবন্ধকতা বিরাজমান সে সম্পর্কে নীতি প্রণয়নকারীদের অবহিত করা। স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি, সেবার মান এবং ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়াবলী তুলে ধরাও এই গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য।

সুনির্দিষ্টভাবে বললে, বর্তমান গবেষণায় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের ওপর আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে :

১. সেবাগ্রহীতাদের বয়স, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং নারী-পুরুষ ভেদে স্বাস্থ্যকেন্দ্র ব্যবহারের ধরন।

২. স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় যে সকল বিষয় অন্তরায় সেগুলোর একটি তালিকা প্রণয়ন (যার মধ্যে রয়েছে ঔষধ ও অন্যান্য চিকিৎসা সামগ্রীর অপর্যাপ্ত সরবরাহ, সেবাপ্রদানকারীদের অনুপস্থিতি, রোগী/সেবাগ্রহণকারীদের কাছ থেকে নিয়ম বহির্ভূত অর্থ আদায় ইত্যাদি)।

৩. পরিকল্পনাপ্রণয়নকারী ও নীতি নির্ধারকদের এই সকল বিষয় অবহিতকরণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও সরকারি সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

এই গবেষণালব্ধ তথ্য নীতিনির্ধারকদের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নসহ আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল সরকারি স্বাস্থ্যসেবা খাতের সুশাসন সম্পর্কিত সমস্যা সমূহ চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের উপায় খুঁজে বের করা। এই লক্ষ্যে দেশের ৭টি বিভাগের প্রতিটি হতে ২টি জেলা হাসপাতাল, ৪টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং ৪টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র দৈবচয়ন ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্বাচন করা হয়। এভাবে সারা দেশ থেকে মোট ৭০টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্বাচন করা হয়েছে যার মধ্যে ১৪টি জেলা হাসপাতাল, ২৮টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং ২৮টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র অন্তর্ভুক্ত। গবেষণার ফলাফল বস্তুনিষ্ঠ করার নিমিত্তে তিন ধরনের উত্তরদাতার নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রথম গ্রুপটি হলো হাসপাতালের প্রধান নির্বাহীগণ (যেমন সিভিল সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ইত্যাদি), দ্বিতীয় গ্রুপটি হলো সেবাপ্রদানকারীগণ (যেমন ডাক্তার, নার্স প্রমুখ) এবং তৃতীয় ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রুপটি হলো সেবাগ্রহীতা অর্থাৎ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আগত রোগী। এছাড়াও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, ধর্মীয় নেতা, স্থানীয় পর্যায়ের নেতাকর্মী, এনজিও কর্মী, স্বাস্থ্যকর্মী, স্থানীয় সাংবাদিক প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে দলগত আলোচনার (Focus Group Discussion) মাধ্যমেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

সারণি ১

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ধরন ও রোগীর সংখ্যা

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ধরন		আন্তবিভাগ রোগী		বহির্বিভাগ রোগী		সর্বমোট
		প্রতি কেন্দ্র থেকে সাক্ষাৎকার নেয়া রোগীর সংখ্যা	মোট রোগী (সকল কেন্দ্র)	প্রতি কেন্দ্র থেকে সাক্ষাৎকার নেয়া রোগীর সংখ্যা	মোট রোগী (সকল কেন্দ্র)	
জেলা হাসপাতাল (সংখ্যা=১৪)		২০	২৮০	৩০	৪২০	৭০০
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স (সংখ্যা=২৮)		১০	২৮০	২০	৫৬০	৮৪০
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র (সংখ্যা=২৮)				১০	২৮০	২৮০
মোট	সংখ্যা		৫৬০		১,২৬০	১,৮২০
	%		(৩০.৮)		(৬৯.২)	(১০০.০)

এই সমীক্ষায় মোট ১,৮২০ জন সেবাগ্রহণকারীর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয় যার মধ্যে ১,২৬০ জন (৬৯.২ শতাংশ) বহির্বিভাগের রোগী এবং ৫৬০ জন (৩০.৮ শতাংশ) আন্তবিভাগ রোগী (সারণি ১)। প্রতিটি জেলা হাসপাতাল থেকে ২০ জন আন্তবিভাগ রোগী এবং ৩০ জন বহির্বিভাগ রোগী দৈবচয়ন ভিত্তিতে নির্বাচিত করে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। একইভাবে প্রতিটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে ১০ জন আন্তবিভাগ এবং ২০ জন বহির্বিভাগ রোগীর সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। সবশেষে প্রতিটি ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে ১০ জন রোগীকে সাক্ষাৎকারের জন্য নির্বাচন করা হয়। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দূরত্ব, সেবাপ্রদানকারীর উপস্থিতি, ঔষধপত্রের প্রাপ্যতা, চিকিৎসাজনিত ব্যয় (নিয়ম বহির্ভূত ব্যয় সহ), সেবার মান এবং রোগীর প্রতি ডাক্তার ও স্টাফদের আচরণ/দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে ।

৪। গবেষণালব্ধ উল্লেখযোগ্য ফলাফল

সেবা গ্রহীতাদের বয়স, লিঙ্গ ও পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সেবাগ্রহণকারীদের মধ্যে মহিলা রোগীর সংখ্যা পুরুষ রোগীদের চেয়ে বেশি। সামগ্রিকভাবে এ হার মহিলাদের ক্ষেত্রে ৫৭ শতাংশ (১,০৩৯ জন) এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে ৪৩ শতাংশ (৭৮১জন)। মোট রোগীর মধ্যে ১৪ শতাংশের বয়স ৫ বছরের নিচে, ১৫ শতাংশের বয়স ৫ থেকে ১৯ বছরের মধ্যে এবং ১৯ শতাংশের বয়স পঞ্চাশ বা তদূর্ধ্ব, তবে সর্বাধিক ৫২ শতাংশের বয়স ২০ থেকে ৪৯ বছরের মধ্যে। উল্লেখ্য যে, বয়স ভিত্তিক বিভাজন অনুযায়ী প্রতি বয়স গ্রুপেই পুরুষ রোগীর সংখ্যা মহিলা রোগীর তুলনায় বেশি (চিত্র ২)। একমাত্র ব্যতিক্রম হলো প্রজননক্ষম বয়স গ্রুপ (১৫-৪৯ বছর), যেখানে পুরুষের তুলনায় মহিলা রোগীর সংখ্যা অনেক বেশি। এর অন্যতম কারণ হলো গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব ও প্রসবোত্তর বিভিন্ন জটিলতার কারণে এ বয়স গ্রুপের মহিলাদের অনেকেই সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সেবা নিতে আসেন।

সারণি ২

বয়স ও লিঙ্গ ভেদে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ব্যবহার

হাসপাতালের ধরন		ব্যবহারকারীর লিঙ্গ				মোট সংখ্যা
		পুরুষ		মহিলা		
		সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	
জেলা হাসপাতাল		৩০৪	৪৩.৪	৩৯৬	৫৬.৬	৭০০
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স		৩৮৯	৪৬.৩	৪৫১	৫৩.৭	৮৪০
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র		৮৮	৩১.৪	১৯২	৬৮.৬	২৮০
সর্বমোট	সংখ্যা	৭৮১	৪২.৯	১,০৩৯	৫৭.১	১,৮২০
	%		৪২.৯		৫৭.১	১০০.০

হাসপাতাল ব্যবহারে লিঙ্গ ভিত্তিক বৈষম্য অল্প বয়সী শিশু ও বয়স্কদের ক্ষেত্রে বেশি প্রকট (চিত্র ২)। সারণি ৩ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, অনূর্ধ্ব এক বছর বয়সী শিশু যারা বহির্বিভাগ চিকিৎসা নিয়েছে

তাদের মধ্যে ৬২ শতাংশ ছেলে ও মাত্র ৩৮ শতাংশ মেয়ে। একইভাবে আন্তবিভাগ মোট শিশু রোগীর মধ্যে ছেলে শিশুর হার ৭৩ শতাংশ এবং মেয়ে শিশুর হার মাত্র ২৭ শতাংশ।

বয়স্ক রোগী (৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব) যারা বহির্বিভাগে সেবা নিতে এসেছেন তাদের মধ্যে পুরুষ রোগী প্রায় ৫৬ শতাংশ ও মহিলা রোগী ৪৪ শতাংশ। তবে আন্তবিভাগ রোগীর ক্ষেত্রে এই লিঙ্গ বৈষম্য আরও প্রকট যেখানে পুরুষ রোগীর সংখ্যা মোট রোগীর ৭০ শতাংশ এবং মহিলা রোগীর হার ৩০ শতাংশ। অসুস্থ অবস্থায় মেয়ে শিশুরা/মহিলারা যে তাদের সমবয়সী ছেলে শিশুদের/পুরুষদের তুলনায় স্বল্প হারে চিকিৎসা পেয়ে থাকেন এ ব্যাপারে অতীতের গবেষণা থেকেও তথ্য উঠে এসেছে। যেমন, বিআইডিএস এর একটি সমীক্ষা থেকে দেখা যায় যে, অনূর্ধ্ব এক বছর বয়সী শিশু রোগী যারা সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য এসেছে তাদের মধ্যে ৬২ শতাংশ ছেলে শিশু ও ৩৮ শতাংশ কন্যা শিশু। একইভাবে ৬৫ বছর ও তদুর্ধ বয়সী রোগী যারা হাসপাতাল সেবা নিয়েছে তাদের মধ্যে মাত্র ৩০ শতাংশ মহিলা ও বাকী ৭০ শতাংশ পুরুষ রোগী (মান্নান ও অন্যান্য, ২০০৩)।

যেহেতু পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে অসুখ-বিসুখে ভোগার সম্ভাবনা প্রায় সমান, তাই উপরোক্ত তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কন্যা শিশু এবং বৃদ্ধ মহিলারা তাদের সমবয়সী পুরুষদের তুলনায় লিঙ্গ বৈষম্যের কারণে অসুস্থ অবস্থায় স্বল্পহারে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা পেয়ে থাকেন।

চিত্র ১: বয়স অনুযায়ী স্বাস্থ্যকেন্দ্র ব্যবহারকারীদের বিন্যাস

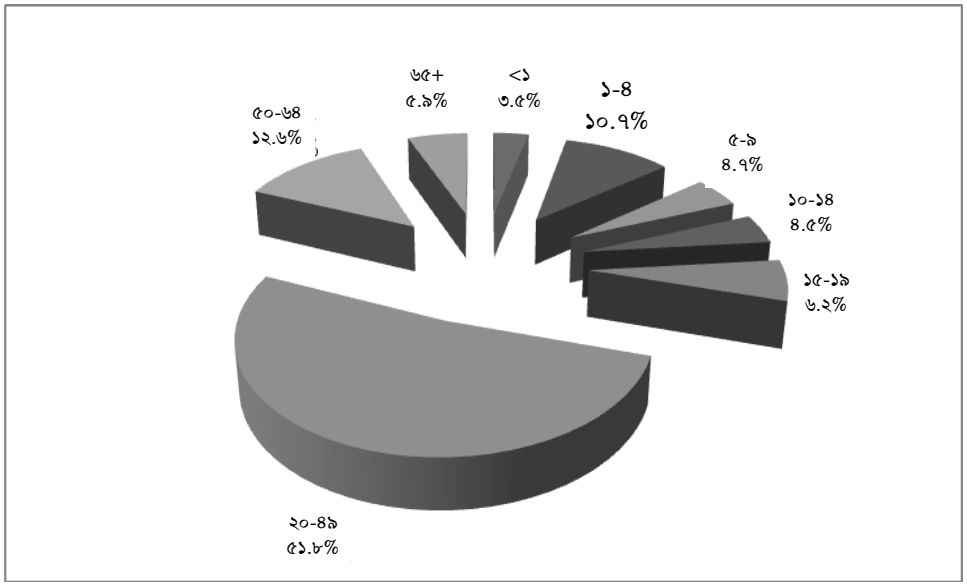

চিত্র ২: বয়স ও লিঙ্গ অনুযায়ী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ব্যবহার

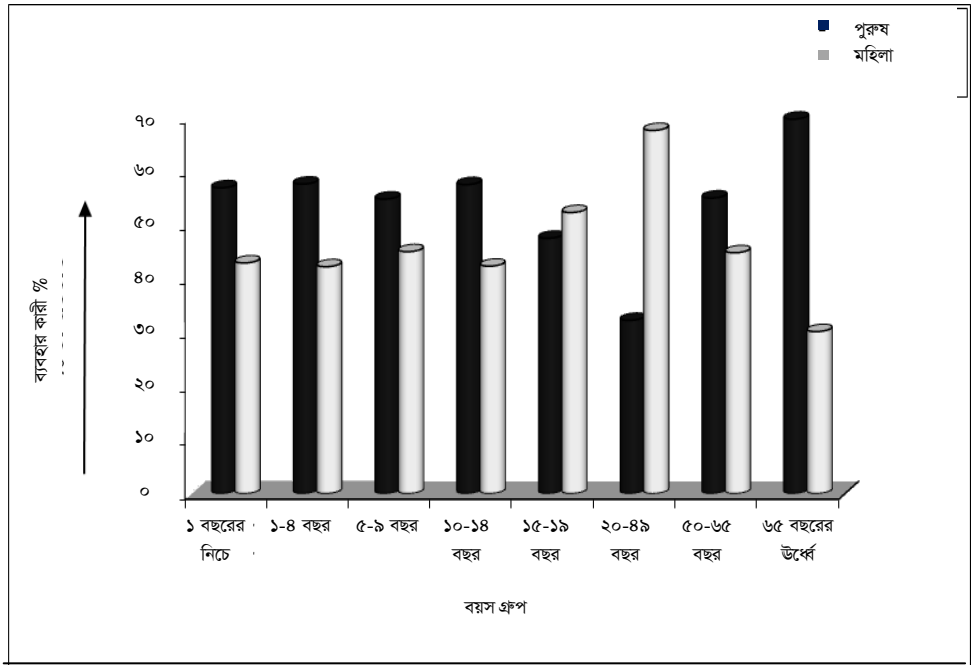

সারণি ৩

আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং লিঙ্গ ভেদে স্বাস্থ্যকেন্দ্র ব্যবহারকারীদের বিভাজন রোগীর ধরন অনুযায়ী

বৈশিষ্ট্য	ব্যবহারকারীদের লিঙ্গ এবং শতকরা হার						সর্বমোট (সংখ্যা)
	বহির্বিভাগ রোগী			আন্তবিভাগ রোগী			
	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	উভয় (সংখ্যা)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	উভয় (সংখ্যা)	
বয়স গ্রুপ (বছর)							
<অনূর্ধ্ব ১	৬১.৯	৩৮.১	৪২	৭২.৭	২৭.৩	২২	৬৪
১-৪	৫৬.২	৪৩.৮	১৬২	৪৮.৫	৫১.৫	৩৩	১৯৫
৫-৯	৫৮.১	৪১.৯	৬২	৫৪.২	৪৫.৮	২৪	৮৬
১০-১৪	৪৯.০	৫১.০	৪৯	৬২.৫	৩৭.৫	৩২	৮১
১৫-১৯	৩৯.২	৬০.৮	৭৯	৪৪.১	৫৫.৯	৩৪	১১৩
২০-৪৯	২৭.১	৭২.৯	৬৫৩	৪০.৭	৫৯.৩	২৯০	৯৪৩
৫০-৬৪	৪৯.৩	৫০.৭	১৫২	৭২.২	২৭.৮	৭৯	২৩১
৬৫+	৫৫.৭	৪৪.৩	৬১	৬৯.৬	৩০.৪	৪৬	১০৭

(চলমান সারণি ৩)

বৈশিষ্ট্য	ব্যবহারকারীদের লিঙ্গ এবং শতকরা হার						সর্বমোট (সংখ্যা)
	বহির্বিভাগ রোগী			আন্তবিভাগ রোগী			
	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	উভয় (সংখ্যা)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	উভয় (সংখ্যা)	
খানা প্রধানের শিক্ষা (সমাপ্ত শিক্ষাবর্ষ)							
নিরক্ষর	৩৩.২	৬৬.৮	৪৬৪	৫৯.০	৪১.০	২১২	৬৭৬
শুধু লিখতে ও পড়তে পারে	৪১.৫	৫৮.৫	৮২	৪৫.৮	৫৪.২	৪৮	১৩০
১-৫	৪৬.৫	৫৩.৫	২৫৮	৪৮.৮	৫১.২	১২৫	৩৮৩
৬-৯	৪১.০	৫৯.০	২৪৪	৪৫.১	৫৪.৯	৮২	৩২৬
১০-১২	৩৮.৭	৬১.৩	১৬৮	৪৭.১	৫২.৯	৬৮	২৩৬
১৩-১৬	৪৭.৭	৫২.৩	৪৪	৪০.০	৬০.০	২৫	৬৯
মালিকানাধীন জমির পরিমাণ (একরে)							
কোনো জমি নেই (বসতবাটি ও নেই)	২৩.৬	৭৬.৪	৫৫	৬৫.৪	৩৪.৬	২৬	৮১
০.০১-০.৫০	৩৭.৫	৬২.৫	৮৫৩	৪৮.৮	৫১.২	৩৮৯	১২৪২
০.৫১-১.৫০	৪৬.১	৫৩.৯	২৩০	৫৩.৯	৪৬.১	৮৯	৩১৯
১.৫১-২.৫০	৪১.৩	৫৮.৭	৭৫	৬৬.৭	৩৩.৩	৩০	১০৫
২.৫১-৫.০০	৫৩.৮	৪৬.২	৩৯	৫০.০	৫০.০	২২	৬১
৫.০০+ একর	৩৭.৫	৬২.৫	৮	২৫.০	৭৫.০	৪	১২

সমীক্ষায় প্রাপ্ত উপাত্ত থেকে দেখা যাচ্ছে যে, আগত রোগীদের ৭৩ শতাংশেরও অধিক ভূমিহীন পরিবারের সদস্য এবং ৪.৫ শতাংশের কোনো বসতভিটাও নেই। অন্যদিকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রোগীর ক্ষেত্রে (৪৪ শতাংশ) পরিবার প্রধানের প্রাতিষ্ঠানিক কোনো শিক্ষা নেই বললেই চলে। সামগ্রিকভাবে সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সেবা গ্রহণে দরিদ্র জনগোষ্ঠীরই প্রাধান্য দেখা যায়। বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয় যখন ইনকাম-কুইন্টাল গ্রুপের ভিত্তিতে রোগীদের বিভাজন বিবেচনা করা হয়। যেমন, চিত্র ৩ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, মোট ব্যবহারকারীদের শতকরা ২৬ ভাগ আয় অনুযায়ী দরিদ্রতম ২০

ভাগ (Q_1) পরিবার থেকে এসেছে এবং মোট ব্যবহারকারীদের শতকরা ৪৮ ভাগই সমাজের দরিদ্রতম চল্লিশভাগ (Q_1 এবং Q_2) পরিবারের সদস্য। পক্ষান্তরে মাত্র শতকরা ১৫ ভাগ সেবাগ্রহণকারী এসেছে বিত্তশালী ২০ ভাগ (Q_5) পরিবার থেকে।

চিত্র ৩: কুইন্টাইল গ্রুপ অনুযায়ী স্বাস্থ্যকেন্দ্র ব্যবহারকারীদের বিন্যাস

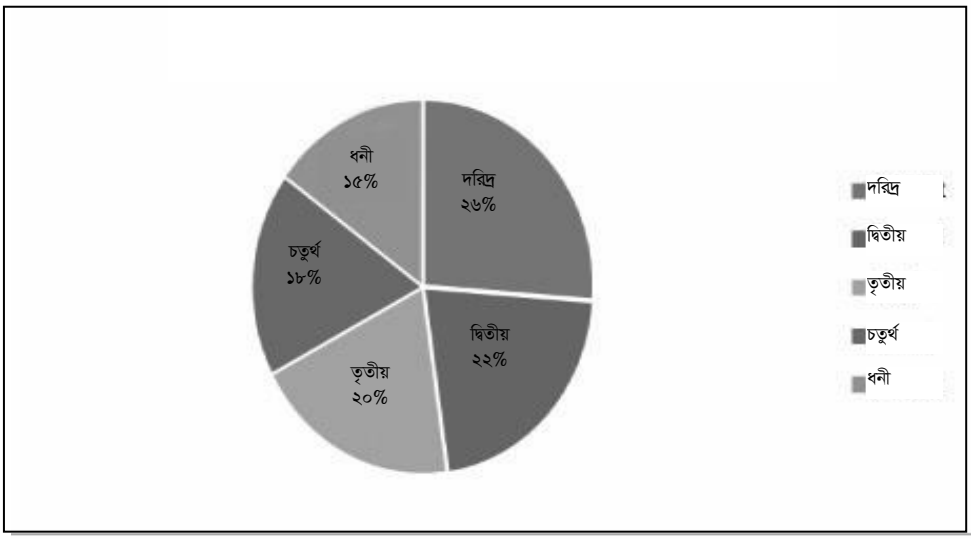

এই ধরনের ফলাফল অতীতে পরিচালিত দুটি সমীক্ষার (বেগম ও অন্যান্য, ২০০১; মান্নান ও অন্যান্য, ২০০৩) ফলাফলের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। যেমন, ২০০৩ সালে জেলা এবং উপজেলা হাসপাতালের মোট রোগীর মধ্যে ৫২ শতাংশ রোগীই নিম্নতম দুটি কুইন্টাইল গ্রুপ থেকে এসেছে (মান্নান ও অন্যান্য, ২০০৩)। আমাদের দেশে আর্থিক দিক থেকে অসচ্ছল মানুষরাই সাধারণত সরকারি হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা গ্রহণ করে ।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সরকারি হাসপাতালে সেবা গ্রহণকারীদের দুই-তৃতীয়াংশই হলো দেশের দরিদ্র জনগণ। সরকারি স্বাস্থ্যসেবাই তাদের শেষ ভরসাস্থল, কেননা ব্যক্তিগতভাবে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া তাদের ক্ষমতার বাইরে। একটি গণতান্ত্রিক দেশের সামাজিক পরিকাঠামোয় দেশের আপামর জনগণের স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়নে সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বিশেষ করে দরিদ্র, অসহায় মানবগোষ্ঠী প্রতিনিয়ত যে রোগব্যধির শিকার হচ্ছেন তাদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভূমিকা অপরিসীম। তাই স্বাস্থ্যখাতে সরকারি ব্যয় আরও বাড়ানো উচিত এবং এই ব্যয়ের সুফল যাতে আরও কার্যকর হয় সেজন্য সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহ এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা থেকে মুক্ত রাখা অতীব প্রয়োজন। আরও প্রয়োজন স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে জড়িত ডাক্তার, নার্স ও টেকনিশিয়ানদের ইতিবাচক ভূমিকা। লক্ষণীয় যে,

বর্তমানে সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কোনো স্বাস্থ্য পরিষেবা পেতে গেলে সেখানকার বিভিন্ন কর্মকর্তা/কর্মচারী ও দালালদের তুষ্ট না করে উপায় নেই। হাসপাতালে সিট পেতে রোগীদের নানা রকম ভোগান্তির শিকার হতে হয়। যেমন, অনেক ক্ষেত্রে ডাক্তারের প্রাইভেট চেম্বারে রোগী দেখাতে হয়, ওয়ার্ড বয়/পিয়ন ও হাসপাতালের নানা কর্মচারী ও দালালদের বখশিস দিতে হয়। ধনী, দরিদ্র নির্বিশেষে সবাইকে এ দুষ্টচক্রের মধ্য দিয়ে যেতে হয়, যা নিম্নের আলোচনা থেকে আরও স্পষ্ট হবে।

চিকিৎসা বাবদ খরচ

সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সেবা গ্রহণের জন্য একজন রোগীকে গড়ে মোট ৮২৫ টাকা খরচ করতে হয়েছে। বহির্বিভাগের একজন রোগীকে গড়ে ৯০ টাকা এবং আন্তবিভাগ রোগীদের গড়ে ২,৪৭৭ টাকা ব্যয় করতে হয়েছে। এই চিকিৎসা খরচের সিংহভাগ ব্যয়িত হয় ঔষধপত্র ও মেডিকেল টেস্ট ফি বাবদ (৫৪৬ টাকা), যা মোট ব্যয়ের ৬৬ শতাংশ। চিকিৎসার আনুষঙ্গিক খরচ হিসেবে রোগীদের যাতায়াত ভাড়া বাবদ গড়ে ৪৪ টাকা, খাবার খরচ বাবদ ৯১ টাকা ও অন্যান্য খরচ বাবদ ১৪৪ টাকা ব্যয়ভার বহন করতে হয়।

সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এসে সেবা লাভের ক্ষেত্রে দূরত্ব, যাতায়াত সময়, যাতায়াত খরচ ইত্যাদি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, সেবাগ্রহণকারীদের বাড়ি থেকে জেলা হাসপাতালের দূরত্ব গড়ে ৯.৪ কি.মি., উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের দূরত্ব ৪.৮ কি.মি. এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের দূরত্ব ১.৭ কি.মি.। অন্যদিকে জেলা হাসপাতালে সেবা পেতে রোগীদের গড়ে ৪২ মিনিট, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ২৭ মিনিট এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে ১৬ মিনিট অপেক্ষা করতে হয়।

বর্তমান গবেষণার একটি ইতিবাচক দিক হলো, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছাতে এবং কেন্দ্রে পৌঁছানোর পর সেবাপ্রদানকারীর সাক্ষাৎ পেতে রোগীদের বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না। তবে ঔষধপত্রের ব্যয়, বিভিন্ন পরীক্ষা/টেস্ট বাবদ খরচ এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত অন্যান্য ব্যয় মেটাতে বেশির ভাগ রোগীকেই হিমশিম খেতে হয় ।

এই চিকিৎসা খরচ মেটাতে একটি পরিবারকে গড়ে মাসিক আয়ের শতকরা ৯ ভাগ ব্যয় করতে হয়। তবে দরিদ্র পরিবারের ক্ষেত্রে এই ব্যয়ের হার অনেক বেশি। যেমন, নিম্নতম আয় উপার্জনকারী দরিদ্র পরিবারগুলো (মাসিক আয় অনূর্ধ্ব ২,০০০ টাকা) তাদের মাসিক আয়ের শতকরা ৩৫ ভাগ চিকিৎসা খরচ মেটাতে ব্যয় করে থাকে। অন্যদিকে ধনী পরিবারগুলো (মাসিক আয় ১৫,০০০ টাকার ঊর্ধ্বে) তাদের আয়ের শতকরা মাত্র ৫ ভাগ চিকিৎসা খাতে ব্যয় করে থাকে (চিত্র ৪)। এই ধরনের মাত্রাতিরিক্ত ব্যয়ের ফলে হতদরিদ্র পরিবারগুলো নানা ধরনের ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। যেমন, অনেক ক্ষেত্রে তাদেরকে জমিজমা/সম্পদ বিক্রি করতে হয় বা ধার-দেনার আশ্রয় নিতে হয়। ফলস্বরূপ পরিবারের অন্যান্য প্রয়োজনীয় খরচ (যেমন, বাচ্চাদের পড়াশুনা, খাদ্যদ্রব্য কেনা) ব্যাহত হয় এবং এভাবে তারা আরও বেশি অসহায় ও নিঃস্ব হয়ে পড়ে।

চিত্র ৪: মাসিক আয়ের কত অংশ চিকিৎসা খাতে ব্যয় হয়

(মাসিক আয়ের গ্রুপ অনুযায়ী)

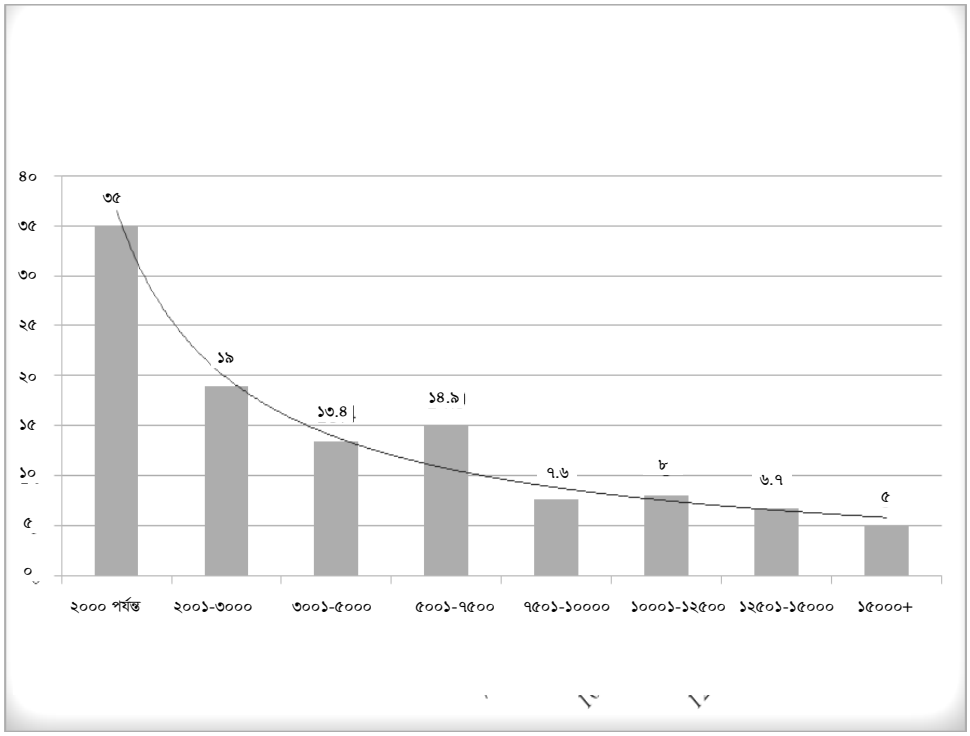

নিয়ম বহির্ভূত খরচ

সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে/স্বল্প খরচে চিকিৎসা সেবা পাওয়ার নিয়ম থাকলেও বাস্তব অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। সরকারি হাসপাতালে/স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা নিতে গিয়ে রোগীদের নানা রকম হেনস্তার সম্মুখীন হতে হয় (সারণি ৪-৭)। সারণি ৪ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সরকারি হাসপাতালে ভর্তি হতে এক-তৃতীয়াংশ রোগীকে (৩২ শতাংশ) জেলা হাসপাতালে এবং এক-পঞ্চমাংশকে (২০ শতাংশ) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ম বহির্ভূত ব্যয় করতে হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এই ব্যয়ের অধিকাংশই (প্রায় তিন-চতুর্থাংশ) দিতে হয়েছে হাসপাতালের নন-মেডিকেল স্টাফদেরকে (ওয়ার্ড বয়, পিয়ন/সাপোর্ট স্টাফ) এবং ডাক্তার/নার্সদের বেলায় খুব সামান্য সংখ্যকের ক্ষেত্রে এ ধরনের ব্যয় করতে হয়েছে। তবে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পূর্বে জেলা হাসপাতালের প্রায় ২২ শতাংশ এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের প্রায় ১২ শতাংশ রোগীকে ঐ হাসপাতালের ডাক্তারদের ব্যক্তিগত চেম্বারে ফি এর বিনিময়ে ব্যবস্থাপত্র নিতে হয়েছে (সারণি ৫)। অন্যদিকে প্রভাবশালী নেতা, আমলা কিংবা স্থানীয় সংসদ সদস্যদের সুপারিশে ১০ শতাংশ রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে (সারণি ৬)। সমীক্ষায়

প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে দেখা যায় যে, দরিদ্র রোগীদের ক্ষেত্রেও নিয়ম বহির্ভূত খরচের ধরন প্রায় একই রকম। যেহেতু দরিদ্র রোগীদের পক্ষে প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের সুপারিশ পাওয়া কষ্টকর ও তাদের নেটওয়ার্ক অনেকটা সীমিত, সেহেতু নিয়ম বহির্ভূত ব্যয়ের ক্ষেত্রে তাদের ঝুঁকি অনেক বেশি। নিয়ম বহির্ভূত খরচের পরিমাণেও বিস্তর ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়–সর্বনিম্ন ব্যয় ১০ টাকা থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ব্যয় সাত হাজার টাকা পর্যন্ত (সারণি ৭)। যারা নিয়ম বহির্ভূত খরচ করেছেন তাদের মধ্যে ৬০ শতাংশ একবার, ৩২ শতাংশ দুইবার এবং অবশিষ্ট ৮ শতাংশ কমপক্ষে ৩ বার এ ধরনের খরচ করতে বাধ্য হয়েছেন।

সারণি ৪

হাসপাতালে ভর্তির জন্য অতিরিক্ত খরচ

(কুইন্টাল গ্রুপ অনুযায়ী)

হাসপাতালের ধরন	কুইন্টাল গ্রুপ	হ্যাঁ		না	
		সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
জেলা হাসপাতাল	Q1	২০	২৫.৬	৫৮	৭৪.৪
	Q2	২০	৩৫.১	৩৭	৬৪.৯
	Q3	১৬	২৯.১	৩৯	৭০.৯
	Q4	২৪	৪০.০	৩৬	৬০.০
	Q5	৯	৩০.০	২১	৭০.০
	মোট	৮৯	৩১.৮	১৯১	৬৮.২
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	Q1	১৫	২১.৪	৫৫	৭৮.৬
	Q2	১১	১৮.০	৫০	৮২.০
	Q3	১২	১৯.৪	৫০	৮০.৬
	Q4	১১	২৪.৪	৩৪	৭৫.৬
	Q5	৬	১৪.৩	৩৬	৮৫.৭
	মোট	৫৫	১৯.৬	২২৫	৮০.৪
মোট	Q1	৩৫	২৩.৬	১১৩	৭৬.৪
	Q2	৩১	২৬.৩	৮৭	৭৩.৭
	Q3	২৮	২৩.৯	৮৯	৭৬.১
	Q4	৩৫	৩৩.৩	৭০	৬৬.৭
	Q5	১৫	২০.৮	৫৭	৭৯.২
	মোট	১৪৪	২৫.৭	৪১৬	৭৪.৩

সারণি ৫

হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার জন্য ডাক্তারের ব্যক্তিগত চেম্বারে ফি' এর বিনিময়ে ব্যবস্থাপত্র প্রদান

(স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ধরন অনুযায়ী)

হাসপাতালের ধরন	হ্যাঁ		না		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
জেলা হাসপাতাল	৬১	২১.৮	২১৯	৭৮.২	২৮০	১০০.০
উপজেলা হাসপাতাল	৩৩	১১.৮	২৪৭	৮৮.২	২৮০	১০০.০
মোট	৯৪	১৬.৮	৪৬৬	৮৩.২	৫৬০	১০০.০

সারণি ৬

হাসপাতালে ভর্তির জন্য প্রভাবশালী ব্যক্তির সুপারিশ প্রয়োজন হয়েছে কিনা

(স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ধরন অনুযায়ী)

সেবার ধরন	হ্যাঁ		না	
	সংখ্যা	সংখ্যা	সংখ্যা	%
জেলা হাসপাতাল	২৯	১০.৪	২৫১	৮৯.৬
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	২৯	১০.৪	২৫১	৮৯.৬
মোট	৫৮	১০.৪	৫০২	৮৯.৬

আন্তবিভাগ রোগীদের জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, সেবা পাওয়ার জন্য হাসপাতালে কাদেরকে অতিরিক্ত টাকা দিতে হয়েছে। যে সমস্ত রোগীকে নিয়ম বহির্ভূত ব্যয় করতে হয়েছে তাদের মধ্যে ৫৪ শতাংশ বলেছেন, পিয়ন/ওয়ার্ড বয়কে অতিরিক্ত টাকা দিতে হয়েছে, প্রায় এক-চতুর্থাংশ উত্তরদাতা (২৭.৮ শতাংশ) উল্লেখ করেছেন কেরানী/প্রশাসনিক কর্মচারীদেরকে অর্থ প্রদান করতে হয়েছে তবে সামান্য সংখ্যক রোগীর ক্ষেত্রে ডাক্তার (১৩.৮ শতাংশ) অথবা নার্সকে (১৬ শতাংশ) এই অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করতে হয়েছে।

সারণি ৭ থেকে দেখা যায় যে, যারা বাড়তি খরচ করেছেন তাদের গড়ে একজন ডাক্তারকে দিতে হয়েছে ৯১৬ টাকা (রেঞ্জ টাকা ৩০-৭০০০), গড়ে একজন নার্সকে দিতে হয়েছে ৮৬ টাকা (রেঞ্জ টাকা ২০০-৪০০), এবং পিয়ন/ওয়ার্ড বয়কে দিতে হয়েছে ৬৪ টাকা (রেঞ্জ টাকা ১০-২০০)। আবার হাসপাতালের অন্য স্টাফদের ক্ষেত্রে (কেরানী/স্টোর কিপার) এই অতিরিক্ত ব্যয়ের পরিমাণ গড়ে ৮১ টাকা (রেঞ্জ টাকা ১০-৪০০), দালালদের দিতে হয়েছে গড়ে ১১৫ টাকা (রেঞ্জ টাকা ২০-২০০), এবং অন্যদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম বহির্ভূত ব্যয়ের পরিমাণ ৫৭ টাকা (রেঞ্জ টাকা ৫-৯০০)। রোগীদের জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কেন এবং কি উদ্দেশ্যে তারা এই নিয়ম বহির্ভূত খরচ করেছেন। অর্ধেকের বেশি উত্তরদাতার মতে, তারা আশঙ্কা করছিলেন যে এই বাড়তি টাকা ব্যয় না করলে তারা কোনো চিকিৎসা

পাবেন না, অথবা তারা হয়রানির শিকার হবেন, অথবা ধীরগতিতে চিকিৎসা চলবে। উপরোক্ত তথ্য থেকে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মানসম্মত সেবা ও সময়োপযোগী চিকিৎসা পাওয়ার আশায় রোগীরা এই ধরনের নিয়ম বহির্ভূত খরচ করতে বাধ্য হন। শুধু টাকা দিলেই সেবা মিলে এ ধারণাও সঠিক নয়। কারণ অতিরিক্ত টাকা খরচ করেও অনেক রোগীই হাসপাতালে সঠিক চিকিৎসা পান না, দলগত আলোচনা থেকে এই ধরনের তথ্য ওঠে এসেছে।

সারণি ৭

আন্তবিভাগ রোগীদের মধ্যে যারা নিয়ম বহির্ভূত খরচ করেছেন তারা কাকে কত টাকা দিয়েছেন

(কুইন্টাল গ্রুপ অনুযায়ী)

কুইন্টাল গ্রুপ		ডাক্তার	নার্স	পিয়ন/ওয়ার্ড বয়	হাসপাতালের অন্যান্য স্টাফ	*দালাল/বহিরাগত*	অন্যান্য
Q1	সংখ্যা	৩	৫	১৮	১৬	১	৩
	গড়	৬৩৩.৩৩	৬৪.০০	৪২.৭৮	৯৬.৮৮	১০০.০০	২১.৬৭
	সর্বনিম্ন	১০০	২০	১০	২০	১০০	৫
	সর্বোচ্চ	১৫০০	১০০	১০০	৪০০	১০০	৫০
Q2	সংখ্যা	৪	৬	১৫	৭	৩	১১
	গড়	৭০০.০০	১২০.৮৩	৮৯.৬৭	৮১.৪৩	১৬৬.৬৭	১১৬.৩৬
	সর্বনিম্ন	১০০	২৫	২০	১০	১০০	৫
	সর্বোচ্চ	২২০০	৪০০	২০০	১৫০	২০০	৯০০
Q3	সংখ্যা	৫	২	১৬	৬	৩	৯
	গড়	৮৮৬.০০	১২৫.০০	৭৪.৩৮	৭০.০০	১০০.০০	৩৬.৬৭
	সর্বনিম্ন	৩০	৫০	২০	১০	১০০	৫
	সর্বোচ্চ	৪০০০	২০০	২০০	২০০	১০০	১২০
Q4	সংখ্যা	৭	৭	২০	৯	১	৪
	গড়	১২৪২.৮৬	৮১.৪৩	৬৪.০০	৭৬.৬৭	২০.০০	১০.০০
	সর্বনিম্ন	১০০	২০	১০	২০	২০	১০
	সর্বোচ্চ	৭০০০	১০০	২০০	১০০	২০	১০
Q5	সংখ্যা	১	৩	৯	২	-	৪
	গড়	৫০০.০০	৪০.০০	৪৬.৬৭	১৫.০০	-	১০.০০
	সর্বনিম্ন	৫০০	২০	২০	১০	-	১০
	সর্বোচ্চ	৫০০	৫০	১০০	২০	-	১০
মোট	সংখ্যা	২০	২৩	৭৮	৪০	৮	৩১
	গড়	৯১৬.৫০	৮৬.৩০	৬৪.১৭	৮১.৫০	১১৫.০০	৫৬.৬১
	সর্বনিম্ন	৩০	২০	১০	১০	২০	৫
	সর্বোচ্চ	৭০০০	৪০০	২০০	৪০০	২০০	৯০০
মোট (%)		১৩.৮	১৫.৯	৫৪.২	২৭.৮	৫.৫	২১.৫

ঔষধের অপর্যাপ্ত সরবরাহ

ঔষধপত্রের অপ্রতুল সরবরাহ সরকারি হাসপাতালের একটি নৈমিত্তিক সমস্যা। প্রয়োজনীয় ঔষধপত্রের যৎসামান্যই রোগীরা হাসপাতাল থেকে পেয়ে থাকেন এবং এর বেশির ভাগই কিনতে হয় খোলা বাজার থেকে । যেমন, বহির্বিভাগ রোগীদের মাত্র ২৩ শতাংশ এবং আন্তবিভাগ রোগীদের মাত্র ৭ শতাংশ ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী হাসপাতাল থেকে সব ধরনের ওষুধ পেয়েছেন। অন্যদিকে ৪৮ শতাংশ বহির্বিভাগ এবং ৬২ শতাংশ আন্তবিভাগ রোগীর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ওষুধের অর্ধেকেরও কম হাসপাতাল থেকে সরবরাহ করা হয়েছে। ইনজেকশন এবং স্যালাইন পাওয়ার ক্ষেত্রে এই অবস্থা আরও নাজুক, শতকরা ৬৬ ভাগ রোগী হাসপাতাল থেকে কোনো স্যালাইন পায়নি এবং ৫৪ ভাগ রোগীকে হাসপাতাল থেকে কোনো ইনজেকশন সরবরাহ করা হয়নি। সর্বোপরি, বহির্বিভাগের ৮ শতাংশ রোগী এবং আন্তবিভাগের ১৪ শতাংশ রোগী হাসপাতাল থেকে কোনো ঔষধপত্রই পায়নি (সারণি ৮)।

সারণি ৮

রোগীরা প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র/এমএসআর কতটুকু (%) স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে পেয়েছে

রোগীর ধরন	দ্রবাদি	কি পরিমাণ পেয়েছে (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Over all
বহির্বিভাগ	ঔষধপত্র	১০০%	২৬.৬	২৭.৩	২১.৭	২১.৮	২০.০	২৩.৯
		৫০% এর বেশি	১৭.৩	১৮.২	২০.০	২২.৭	২৩.১	১৯.৯
		৫০% এর কম	৪৯.৫	-	-	-	-	৪৮.৩
		কিছুই না	৬.৫	৮.০	৭.২	১০.৪	৮.২	৭.৯
	ইনজেকশন	১০০%	৫.৫	৬.৯	৬.৬	৩.৩	৫.৪	৫.৫
		৫০% এর বেশি	০.০	০.০	১.৯	৩.৩	২.২	১.৩
		৫০% এর কম	০.০	১.৫	৩.৮	১.৭	৩.২	১.৮
		কিছুই না	৯৪.৫	৯১.৫	৮৭.৭	৯১.৭	৮৯.২	৯১.৩
	স্যালাইন/আইভি ফ্লুইড	১০০%	২.১	১.৬	১.০	১.৭	৩.৪	১.৯
		৫০% এর বেশি	০.০	০.৮	১.০	৫.২	১.১	১.৬
		৫০% এর কম	৩.৫	২.৪	৩.০	০.৯	৩.৪	২.৬
		কিছুই না	৯৪.৪	৯৫.২	৯৫.০	৯২.২	৯২.০	৯৩.৯
আন্তবিভাগ	ঔষধপত্র	১০০%	১২.৩	১০.৩	৩.৪	২.৯	৪.২	৭.২
		৫০% এর বেশি	১৭.৮	১৭.৯	১৭.১	১৩.৩	১৮.১	১৬.৯
		৫০% এর কম	৫৬.৮	৫৫.৬	৬৫.৮	৬৫.৭	৬৮.১	৬১.৬
		কিছুই না	১৩.০	১৬.২	১৩.৭	১৮.১	৯.৭	১৪.৪
	ইনজেকশন	১০০%	১২.৩	১৬.১	১১.৮	৬.৪	১০.৪	১১.৭
		৫০% এর বেশি	৯.৮	৮.০	১১.৮	২.১	৯.০	৮.৩
		৫০% এর কম	১৯.৭	২২.৩	২৭.৩	৩১.৯	৩১.৩	২৫.৭
		কিছুই না	৫৮.২	৫৩.৬	৪৯.১	৫৯.৬	৪৯.৩	৫৪.৩
	স্যালাইন/ আইভি ফ্লুইড	১০০%	১১.৪	১০.৬	১৮.৮	৫.৬	১৫.০	১২.১
		৫০% এর বেশি	৬.১	৬.৭	৬.৩	৭.৯	৮.৩	৬.৯
		৫০% এর কম	৯.৬	১৭.৩	১৭.৭	১৫.৭	১৬.৭	১৫.১
		কিছুই না	৭২.৮	৬৫.৪	৫৭.৩	৭০.৮	৬০.০	৬৫.৯

হাসপাতালে ঔষধপত্র না পাওয়ার কারণ সম্পর্কে বহির্বিভাগ এবং আন্তবিভাগ রোগীদের ক্ষেত্রে কিছুটা মতপার্থক্য বিদ্যমান। যেমন, বহির্বিভাগ এবং আন্তবিভাগ রোগীদের তিন-পঞ্চমাংশই (প্রায় ৫৯ শতাংশ) মনে করেন যে ঔষুধপত্রের অপ্রতুল সরবরাহই এর অন্যতম কারণ। পক্ষান্তরে এক-তৃতীয়াংশের বেশি আন্তবিভাগ রোগীর (৩৭.৬ শতাংশ) মতে ওষুধের কালোবাজারি/অপচয়ের কারণে তারা প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র পাওয়া থেকে বঞ্চিত, তবে বহির্বিভাগ রোগীর ক্ষেত্রে এই হার কিছুটা কম (২৬.৬ শতাংশ)। অন্যদিকে আন্তবিভাগ রোগীদের ১৫.৮ শতাংশ এবং বহির্বিভাগ রোগীদের ৮.৩ শতাংশ মনে করেন যে অতিরিক্ত টাকা না দেয়ার কারণে তাদেরকে হাসপাতাল থেকে প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র দেয়া হয় না।

সারণি ৯

হাসপাতাল থেকে প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র না পাওয়ার কারণ সম্পর্কে রোগীদের মতামত

(কুইন্টাল গ্রুপ অনুযায়ী)

রোগীর ধরন	ঔষধপত্র না পাওয়ার কারণ	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	সর্বমোট
বহির্বিভাগ	অপ্রতুল সরবরাহ	৫৯.৭	৫৯.০	৫৭.৮	৫৯.৩	৫৮.০	৫৮.৯
	টাকা না দিলে কোনো ঔষধ পাওয়া যায় না	৬.৮	৮.৯	৯.৩	১০.৩	৭.০	৮.৩
	ঔষধের অপচয়/কালোবাজারী	২৫.২	২৮.৪	২৮.৩	২৯.০	২২.৫	২৬.৭
	জানি না	২৬.৮	২৬.২	২৪.৯	১৯.২	৩০.৫	২৫.৬
	অন্যান্য	৪.৩	১.৮	৪.২	৪.৭	৩.৫	৩.৭
আন্তবিভাগ	অপ্রতুল সরবরাহ	৫৫.১	৬০.৩	৬০.৩	৫৭.১	৬৩.৯	৫৮.৮
	টাকা না দিলে কোনো ঔষধ পাওয়া যায় না	১৯.০	১৪.৭	১৮.১	১৩.৩	১১.১	১৫.৮
	ঔষধের অপচয়/কালোবাজারী	২৮.৬	৩৬.২	৪০.৫	৪৯.৫	৩৬.১	৩৭.৬
	জানি না	২১.৮	২২.৪	১৮.১	১৭.১	২৩.৬	২০.৫
	অন্যান্য	৫.৪	৩.৪	৫.২	৫.৭	১.৪	৪.৫
মোট	অপ্রতুল সরবরাহ	৫৮.৩	৫৯.৪	৫৮.৬	৫৮.৬	৫৯.৬	৫৮.৮
	টাকা না দিলে কোনো ঔষধ পাওয়া যায় না	১০.৬	১০.৬	১২.২	১১.৩	৮.১	১০.৬
	ঔষধের অপচয়/কালোবাজারী	২৬.৩	৩০.৭	৩২.৩	৩৫.৭	২৬.১	৩০.১
	জানি না	২৫.২	২৫.১	২২.৭	১৮.৫	২৮.৭	২৪.০
	অন্যান্য	৪.৭	২.৩	৪.৫	৫.০	২.৯	৩.৯

সারণি ১০

প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র হাসপাতাল থেকে না পাওয়ার কারণে স্বাস্থ্যর উপর নেতিবাচক প্রভাব

রোগীর ধরন	কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে কি	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	সর্বমোট
বহির্বিভাগ	হ্যাঁ, পুরোপুরিভাবে	১৬.০	৮.৯	৯.২	৭.৪	১৫.৫	১১.৬
	হ্যাঁ,অনেকাংশে	২৯.৮	৩০.৯	৩৪.৫	২৫.০	৩৫.০	৩০.৯
	হ্যাঁ, কিছুটা	৩৩.৪	৩২.৩	২৯.০	৪০.৩	২৯.০	৩২.৮
	আদৌ না	২০.৯	২৭.৯	২৭.৩	২৭.৩	২০.৫	২৪.৭
আন্তবিভাগ	হ্যাঁ, পুরোপুরিভাবে	২৯.৩	২৪.৮	২০.৫	২০.০	২২.২	২৩.৮
	হ্যাঁ,অনেকাংশে	৩৮.৮	৩৪.২	৪৪.৪	৪২.৯	৪৪.৪	৪০.৫
	হ্যাঁ, কিছুটা	২৪.৫	৩০.৮	২৭.৪	২৪.৮	২৬.৪	২৬.৭
	আদৌ না	৭.৫	১০.৩	৭.৭	১২.৪	৬.৯	৯.০
মোট	হ্যাঁ, পুরোপুরিভাবে	২০.১	১৩.৭	১৩.০	১১.৫	১৭.৩	১৫.৪
	হ্যাঁ,অনেকাংশে	৩২.৬	৩১.৯	৩৭.৭	৩০.৮	৩৭.৫	৩৩.৯
	হ্যাঁ, কিছুটা	৩০.৭	৩১.৯	২৮.৫	৩৫.২	২৮.৩	৩০.৯
	আদৌ না	১৬.৭	২২.৫	২০.৮	২২.৪	১৬.৯	১৯.৮

সারণি ১০ থেকে দেখা যাচ্ছে যে বহির্বিভাগের ৪২.৫ শতাংশ এবং আন্তবিভাগের ৬৪.৩ শতাংশ রোগীর মতামত অনুযায়ী হাসপাতাল থেকে প্রয়োজনীয় ঔষুধপত্র না পাওয়ার কারণে স্বাস্থ্য সেবা দারুণভাবে ব্যাহত হয়েছে এবং চিকিৎসা চাহিদা মেটাতে তাদেরকে নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। স্বাস্থ্যের উপর এর কুফল ও নেতিবাচক প্রভাব সুদূরপ্রসারী।

ডাক্তারের অনুপস্থিতি

ডাক্তার ও নার্সের অনুপস্থিতি/অবহেলা, চিকিৎসা কেন্দ্রের অন্যান্য জনবলের দায়িত্ব পালনে অবহেলা ও রোগীর প্রতি বিরূপ আচরণের ফলে আগত রোগীরা নানা রকম ভোগান্তির শিকার হয়ে থাকেন। ডাক্তারের অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে দুটো বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, অনেক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পদের তুলনায় ডাক্তারের সংখ্যা কম থাকে এবং দিনের পর দিন এই পদগুলো খালিই পড়ে থাকে। দ্বিতীয়ত, পদের বিপরীতে ডাক্তার বর্তমান থাকলেও অনেক সময় তারা "প্রাইভেট প্র্যাকটিসে" ব্যস্ত থাকার কারণে সময় দিতে পারেন না এবং রোগীর চিকিৎসা করার ব্যাপারেও ব্যক্তিগত উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের সময় দেখা গিয়েছে যে, সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তারের উপস্থিতি ও তাঁদের আন্তরিকতা নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্নের অবকাশ রয়েছে -ডাক্তারদের মধ্যে অনেকেই অফিস চলাকালীন সময়ে হাসপাতালের মধ্যে, অথবা প্রাইভেট চেম্বারে, অথবা অন্য কোনো ক্লিনিকে প্রাইভেট প্র্যাকটিসে ব্যস্ত থাকেন।

দলগত আলোচনা থেকেও এর সমর্থনে তথ্য এসেছে। বেশির ভাগ আলোচকই বলেছেন যে, ডাক্তাররা সবসময় থাকেন না এবং অন্যান্য সেবাপ্রদানকারীদের পাওয়াও কঠিন। আবার চিকিৎসকদের কাছ থেকে রোগীরা ভালো ব্যবহার পান না বলেও প্রায়ই অভিযোগ পাওয়া যায়। এছাড়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বেশির ভাগ কর্মকর্তা/কর্মচারীর আচরণ এবং ব্যবহারও বন্ধুসুলভ নয়। তাই দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও নিয়মিত তদারকির ব্যবস্থা নিশ্চিত না করে শুধুমাত্র ডাক্তার ও নার্সের শূণ্য পদ পূরণ করলেই যে রোগীদের কাছে পর্যাপ্ত মানসম্মত সেবা পৌঁছাবে তারও নিশ্চয়তা নেই।

সরকারি হাসপাতালের ডাক্তাররা রোগী দেখা ও অন্যান্য কাজে কতটুকু সময় ব্যয় করেন সে ব্যাপারে চমকপ্রদ তথ্য পাওয়া যায় ২০০৪ সালের একটি গবেষণা থেকে (মান্নান ও হাওলাদার, ২০০৪)। চিত্র ৫ থেকে ৭ এ উক্ত সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। উক্ত সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জেলা হাসপাতালের ডাক্তাররা তাদের সময়ের মাত্র ৪৯ শতাংশ প্রত্যক্ষ রোগী দেখায় ব্যয় করেন, অন্যদিকে ৪৫ শতাংশ সময় ব্যয় হয় অনুৎপাদনশীল খাতে। অনুৎপাদনশীল কাজের অন্তর্ভুক্ত হলো: (১) রোগীর জন্য অপেক্ষা, (২) চা-নাস্তা ও লাঞ্চের জন্য ব্যয়িত সময়, (৩) সাক্ষাৎ প্রার্থী/সহকর্মীদের সাথে গল্পগুজব/আড্ডা দেয়া, (৪) প্রার্থনা, এবং (৫) ব্যক্তিগত পরিচর্যা ইত্যাদি। শতকরা মাত্র ১ ভাগ সময় ব্যয় হয় হেলথ প্রমোশন কাজে এবং ৫ ভাগ সময় ব্যয় হয় প্রশাসনিক কাজে।

চিত্র ৫: কি ধরনের কাজে ডাক্তারদের কতটুকু সময় ব্যয় হয়
(জেলা হাসপাতালের চিত্র)

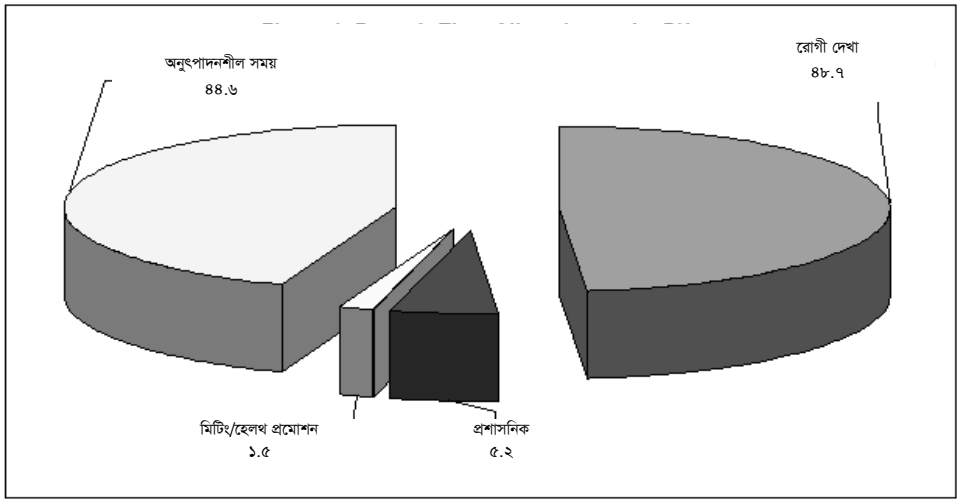

উৎস: মান্নান ও হাওলাদার (২০০৪)।

একইভাবে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কর্মরত ডাক্তাররা মাত্র ৪২ ভাগ সময় ব্যয় করেন রোগীর চিকিৎসায়, ৪৮ ভাগ সময় ব্যয় হয় অনুৎপাদনশীল কাজে, এবং ৪ ভাগ সময় ব্যয় হয় প্রশাসনিক কাজে। তবে ইউনিয়ন পর্যায়ের স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অবস্থা আরও হতাশাব্যঞ্জক। সেবা প্রদানকারীগণ মাত্র

এক-চতুর্থাংশ (২৬ শতাংশ) সময় প্রত্যক্ষ রোগী দেখার কাজে ব্যয় করেন। অন্যদিকে ৫৮ শতাংশ সময় ব্যয় হয় অনুৎপাদনশীল কাজে, ৮ ভাগ ব্যয় হয় হেলথ প্রমোশন কাজে এবং আরও ৮ ভাগ সময় ব্যয় হয় প্রশাসনিক কাজে।

চিত্র ৬: কর্মস্থলে কর্মভেদে ডাক্তারদের সময়ের বণ্টন (উপজেলা হাসপাতালের চিত্র)

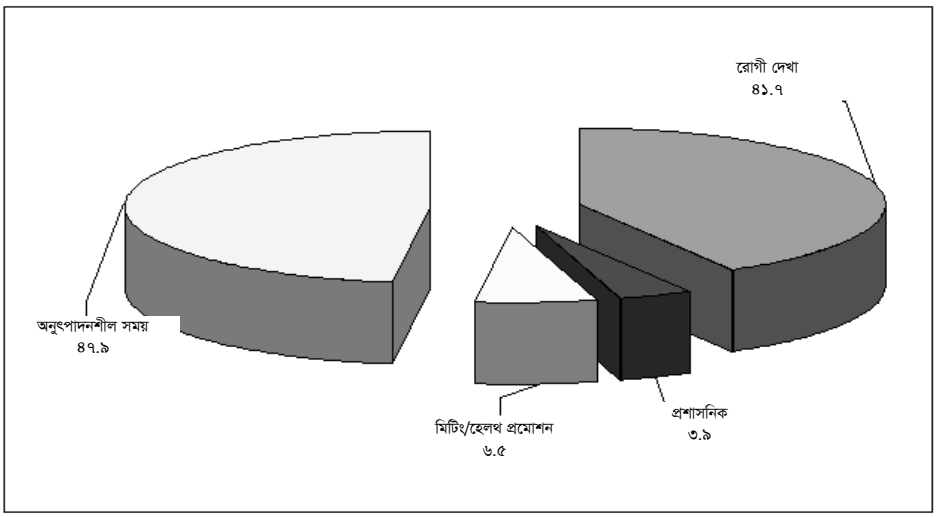

উৎস: মান্নান ও হাওলাদার (২০০৪)।

চিত্র ৭: কর্মস্থলে কর্মভেদে সেবাপ্রদানকারীদের সময় বণ্টন (ইউনিয়ন পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের চিত্র)

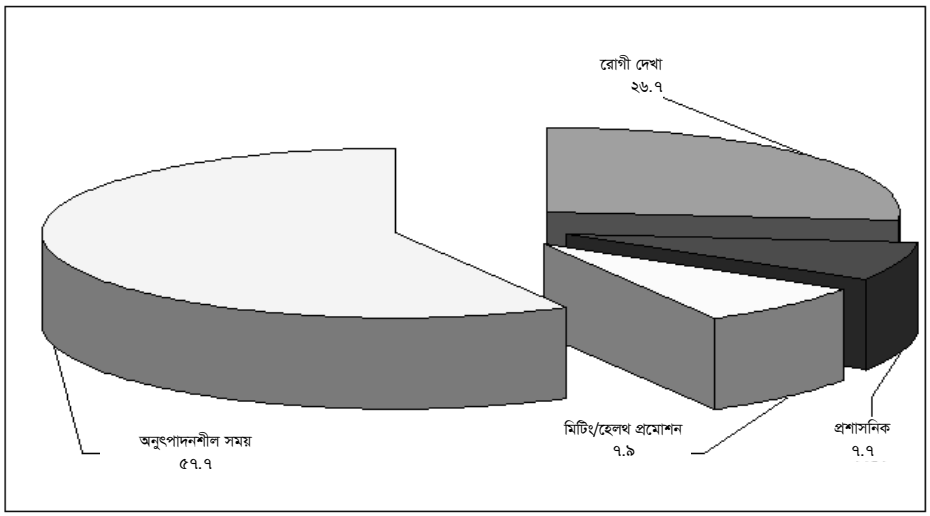

উৎস: মান্নান ও হাওলাদার (২০০৪)।

উপরের তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, হাসপাতালে কর্মরত ডাক্তার/সেবাপ্রদানকারীদের সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশই অলস-সময় হিসেবে ব্যয় হয় এবং হাসপাতালে অবস্থানকালীন সময়ের নগণ্য অংশ্যই প্রত্যক্ষ রোগী দেখার কাজে ব্যয় করা হয়। জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের স্বাস্থ্যকেন্দ্র সমূহে ডাক্তার/সেবাপ্রদানকারীরা কিভাবে সময় ব্যয় করেন সেই ব্যাপারে একটি নৈরাশ্যজনক চিত্রই ওঠে এসেছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, সেবাপ্রদানকারীদের অনেকেই অলস সময় কাটান এবং অন্যদিকে রোগীদেরকে প্রাপ্য সময় দেয়া হয় না। ডাক্তারদের প্রত্যাশিত কর্ম-সময় এবং বাস্তব চিত্রের মধ্যে বিরাট ফারাক, যা অনাকাঙ্ক্ষিত, জনস্বার্থ পরিপন্থী এবং স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বিরাট অন্তরায়। এ সব নেতিবাচক বিষয়ের কারণে সিয়েট (CIET) সমীক্ষা অনুযায়ী মাত্র শতকরা ১০ ভাগ রোগী সরকারি হাসপাতালে স্বাস্থ্য সেবার মান সম্পর্কে ইতিবাচক মতামত দিয়েছেন (সিয়েট কানাডা ও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ২০০১)। বর্তমান সমীক্ষায়ও সরকারি হাসপাতালে সেবার মান সন্তোষজনক নয় বলেই অধিকাংশ রোগী মতামত প্রদান করেছেন, যা নিম্নের আলোচনা থেকে আরও স্পষ্ট হবে।

সেবাগ্রহণকারীর সন্তুষ্টি

এই গবেষণায় দশটি ভিন্ন ধরনের সেবা যেমন ডাক্তার/নার্সদের উপস্থিতি, রোগীর প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ, ঔষধের প্রাপ্যতা, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে রোগীর সন্তুষ্টির মাত্রা নির্ধারণের মাধ্যমে সেবার মান (চমৎকার, ভাল, গড়পড়তা, খারাপ এবং খুব খারাপ) যাচাই করা হয়েছে (সারণি ১১)। প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা গেছে, খুব কম সংখ্যক উত্তরদাতাই (২০ শতাংশেরও কম) ডাক্তারদের উপস্থিতি/প্রাপ্যতার ব্যাপারে পুরোপুরি সন্তুষ্ট, অন্যদিকে শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ রোগী সেবার গুণগত মানে বেশ অসন্তুষ্ট। তাদের এরূপ মতামতের/অসন্তুষ্টির অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মাত্র ২০ শতাংশ রোগীর ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপত্র লিখার পূর্বে ডাক্তার রোগীকে শারীরিকভাবে পরীক্ষা করেছেন (যেমন, নাড়ি দেখা, প্রেসার মাপা ইত্যাদি) এবং ৩৫ শতাংশ রোগী ডাক্তারদের কাছ থেকে শুধুমাত্র উপদেশ ছাড়া আর কিছুই পায়নি। তাছাড়া হাসপাতালে ঔষধের অপর্যাপ্ত সরবরাহ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাব, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আচরণ, ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা করা ইত্যাদি বিষয় নিয়েও অধিকাংশ রোগীর মধ্যেই অসন্তুষ্টি লক্ষ করা গেছে।

রোগীদের জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কেন তারা সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সেবা নিতে এসেছেন। উত্তরদাতারা যে সব কারণ উল্লেখ করেছেন (সারণি ১২) তার মধ্যে এক-তৃতীয়াংশের মতামত হলো, "মানসম্মত চিকিৎসার জন্য," প্রতি দশজনে আটজন বলেছেন, "বিনামূল্যে অথবা স্বল্পমূল্যে" চিকিৎসা সেবা পাওয়ার আশায়। কিন্তু সমীক্ষার ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের প্রধান দুটি প্রত্যাশার কোনোটিই পূর্ণ হয়নি। প্রথমত, বিনামূল্যে চিকিৎসার কথা বলা থাকলেও ঔষধপত্র ক্রয় ও নিয়ম বহির্ভূত খরচ হিসেবে রোগীদেরকে অনেক টাকা ব্যয় করতে হয়। দ্বিতীয়ত, মানসম্মত চিকিৎসা সেবার ব্যাপারেও রোগীদের যথেষ্ট অভিযোগ আছে। যেমন, ডাক্তারের অনুপস্থিতি, রোগীর প্রতি অবজ্ঞা/অবহেলা, রোগ নির্ণয়ে স্বল্প সময় ব্যয় করা ইত্যাদি কারণে রোগীরা হতাশ ও ক্ষুব্ধ।

সারণি **১১**

রোগীর ধরন অনুযায়ী হাসপাতাল সেবার মানের মূল্যায়ন (Rating)

সেবার ধরন	সেবার মানের মূল্যায়ন (%)					মোট
	চমৎকার	ভালো	মোটামুটি	খারাপ	খুব খারাপ	
বহির্বিভাগ রোগী						
সেবাদানকারীর আচরণ/দৃষ্টিভঙ্গি	১.৮	৩৬.৭	৫২.৩	৮.৯	০.৪	১,২৫৭
অফিস স্টাফদের আচরণ/দৃষ্টিভঙ্গি	০.২	১৬.৩	৫৪.৩	২৭.২	২.১	১,২৫১
পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ	০.৬	৬.৪	৪১.০	৪১.০	১০.৯	৩২৯
চিকিৎসার গোপনীয়তা	০.০	১০.৪	৫৩.৩	২৯.০	৭.৩	১,২৩৬
খাবারের মান	০.০	২.০	১৫.২	৫৫.৮	২৬.৯	১৯৭
ডাক্তারের সাক্ষাৎ পাওয়ার জন্য অপেক্ষা	০.০	৮.৪	৩৮.৭	৪১.৫	১১.৪	১,২৪৪
সেবাদানকারীর প্রাপ্যতা	০.৭	১৯.৩	৫৩.৪	২৪.৩	২.৪	১,২২৫
ঔষধপত্রের প্রাপ্যতা	০.৫	৮.৬	৩১.৭	৪৬.৭	১২.৫	১,২৪৩
ডাক্তারী সরঞ্জামাদির প্রাপ্যতা	০.১	৮.৪	৫৩.০	২৮.৫	১০.০	৯৬৮
চিকিৎসার মান	০.৩	২৭.১	৫৮.৮	১২.৩	১.৫	১,২৩০
আন্তবিভাগ রোগী						
সেবাদানকারীর আচরণ/দৃষ্টিভঙ্গি	২.০	৪০.৪	৫০.৪	৬.৮	০.৫	৫৬০
অফিস স্টাফদের আচরণ/দৃষ্টিভঙ্গি	০.৪	১৬.৫	৪৯.৪	২৯.৭	৪.১	৫৫৯
পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ	০.২	৪.৩	৩৩.১	৪৪.২	১৮.৩	৫৪১
চিকিৎসার গোপনীয়তা	০.৪	১০.১	৫৩.২	৩১.৬	৪.৭	৫৫৪
খাবারের মান	০.০	২.৪	২৪.০	৪৬.৮	২৬.৮	৫৩৮
ডাক্তারের সাক্ষাৎ পাওয়ার জন্য অপেক্ষা	০.২	৪.৭	৫১.৯	৩৮.২	৫.০	৫৫৫
সেবাদানকারীর প্রাপ্যতা	০.৫	১৫.২	৫৪.৭	২৭.০	২.৫	৫৫৯
ঔষধপত্রের প্রাপ্যতা	০.০	৪.৭	২৫.৩	৫৩.০	১৬.৯	৫৪৯
ডাক্তারী সরঞ্জামাদির প্রাপ্যতা	০.২	৯.২	৫২.১	২৭.৪	১১.১	৫২২
চিকিৎসার মান	০.৪	২৪.৪	৬০.৫	১৩.০	১.৮	৫৫৪

সারণি ১২

রোগীর ধরন অনুযায়ী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসার কারণ

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসার কারণ	রোগীর ধরন		মোট (%)
	বহির্বিভাগ	আন্তবিভাগ	
মানসম্মত চিকিৎসা	৩৪.৩	৪২.৩	৩৬.৮
বিনামূল্যে/স্বল্প খরচের চিকিৎসা	৮৬.২	৭৮.৪	৮৩.৮
বাড়ির কাছে/বাসা থেকে দূরে নয়	৪৮.০	৪৪.১	৪৬.৮
আত্মীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চাকুরী করে	১.৯	২.৩	২.০
স্বল্প যাতায়াত খরচ	১৫.০	১৬.৪	১৫.৪
অন্যান্য	০.৬	২.০	১.০
নিরুত্তর	০.২	০.০	০.১
মোট	১০০.০ (১,২৬০)	১০০.০ (৫৬০)	১০০.০ (১,৮২০)

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই গবেষণায় চিকিৎসা সেবার দশটি ভিন্ন ধরনের সূচকের মাধ্যমে হাসপাতাল সেবার মান সম্পর্কে রোগীদের মতামত যাচাই করা হয়েছে। উত্তরদাতাদের জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, তাদের মতে চিকিৎসা সেবার মধ্যে কোন দুটি সূচক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রাপ্ত ফলাফল (সারণি ১৩) থেকে দেখা যায় যে, এক-তৃতীয়াংশ উত্তরদাতার মতে ডাক্তারের দৃষ্টিভঙ্গি/আচরণ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় (৩৪.২ শতাংশ)। এর পরে রয়েছে পর্যাপ্ত ঔষধপত্রের সরবরাহ (২১.১ শতাংশ) এবং চিকিৎসা সেবার মান (১২.১ শতাংশ)। একইভাবে দ্বিতীয় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সূচকের বিষয়ে (সারণি ১৪) প্রায় এক-চতুর্থাংশ (২৮.৯ শতাংশ) উত্তরদাতা উল্লেখ করেছেন ঔষধপত্রের প্রাপ্যতা/সরবরাহের বিষয়, এর পরে রয়েছে ডাক্তারের উপস্থিতি (১৭.৪ শতাংশ), ডাক্তার/সেবাপ্রদানকারীর দৃষ্টিভঙ্গি/আচরণ (১১.৪ শতাংশ), এবং চিকিৎসা সেবার মান (১১.২ শতাংশ)।

যদি প্রথম এবং দ্বিতীয় পছন্দের তালিকা একসাথে বিবেচনা করা হয় তাহলে দেখা যায় যে, হাসপাতাল সেবার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সূচক হলো পর্যাপ্ত ঔষধপত্রের সরবরাহ (৫০ শতাংশ), দ্বিতীয় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সূচক হলো সেবাপ্রদানকারীর দৃষ্টিভঙ্গি/আচরণ (৪৫.৬ শতাংশ) এবং এর পরে রয়েছে ডাক্তারের উপস্থিতি (২৮.৭ শতাংশ)। সুতরাং এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ঔষধপত্রের প্রাপ্যতা এবং সেবাপ্রদানকারীর উপস্থিতিই রোগীদের কাছে হাসপাতাল সেবার অন্যতম মানদণ্ড। কিন্তু দু:খজনক হলেও সত্যি যে, এ দুটোর কোনোটির ক্ষেত্রেই উত্তরদাতাদের মূল্যায়ন আশাব্যঞ্জক নয়। দলগত আলোচনা থেকেও দেখা গেছে যে, অধিকাংশ আলোচকের মতে ঔষধপত্রের কালোবাজারি/অপচয়, ডাক্তারদের অনুপস্থিতি, হাসপাতাল স্টাফদের বিরূপ মনোভাব, নার্স/ওয়ার্ড বয়দের অসহযোগিতার ফলে সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কাঙ্ক্ষিত সেবা লাভ থেকে রোগীরা বঞ্চিত হয়। দলগত আলোচনা থেকেও উপরোক্ত চিত্রের সমর্থনে তথ্য এসেছে।

সারণি ১৩

প্রথম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতালের সেবা সম্পর্কে মতামত

(রোগীর ধরন অনুযায়ী)

সেবার ধরন	রোগীর ধরন		মোট (%)
	বহির্বিভাগ	আন্তবিভাগ	
সেবাদানকারীর আচরণ/দৃষ্টিভঙ্গি	৩৪.৮	৩২.৭	৩৪.২
অফিস স্টাফদের আচরণ/দৃষ্টিভঙ্গি	৫.৯	৭.০	৬.২
পরিস্কার পরিছন্নতা ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ	১.২	৯.১	৩.৬
চিকিৎসার গোপনীয়তা	৩.৭	১.৬	৩.১
খাবারের মান	০.৬	৪.৮	১.৯
ডাক্তারের সাক্ষাৎ পাওয়ার জন্য অপেক্ষা	৭.১	০.৫	৫.১
সেবাদানকারীর প্রাপ্যতা	১২.০	৯.৭	১১.৩
ঔষধপত্রের প্রাপ্যতা	২১.৮	১৯.৫	২১.১
ডাক্তারী সরঞ্জামাদির প্রাপ্যতা	১.৭	০.৭	১.৪
চিকিৎসার মান	১১.২	১৪.৩	১২.১
মোট	**১,২৫৫**	**৫৫৯**	**১,৮১৪**

সারণি ১৪

দ্বিতীয় সর্বাধিক গুরত্বপূর্ণ হাসপাতালের সেবা সম্পর্কে মতামত

(রোগীর ধরন অনুযায়ী)

সেবার ধরন	রোগীর ধরন		মোট (%)
	বহির্বিভাগ	আন্ত:বিভাগ	বহির্বিভাগ
সেবাদানকারীর আচরণ/দৃষ্টিভঙ্গি	১২.০	১০.০	১১.৪
অফিস স্টাফদের আচরণ/দৃষ্টিভঙ্গি	৬.৫	৫.৫	৬.২
পরিস্কার-পরিছন্নতা ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ	১.৬	৭.৯	৩.৫
চিকিৎসার গোপনীয়তা	৬.২	৫.৯	৬.১
খাবারের মান	০.৫	৯.৭	৩.৩
ডাক্তারের সাক্ষাৎ পাওয়ার জন্য অপেক্ষা	১০.৮	২.৭	৮.৩
সেবাদানকারীর প্রাপ্যতা	১৮.০	১৬.৩	১৭.৪
ঔষধপত্রের প্রাপ্যতা	২৮.৭	২৯.২	২৮.৯
ডাক্তারী সরঞ্জামাদির প্রাপ্যতা	৩.৮	৩.৪	৩.৬
চিকিৎসার মান	১২.০	৯.৫	১১.২
মোট	**১,২৫৩**	**৫৫৯**	**১,৮১২**

দেখা যাচ্ছে যে, বিনামূল্যে অথবা স্বল্প খরচে এবং মানসম্মত চিকিৎসা লাভের প্রত্যাশা নিয়েই অধিকাংশ রোগী সরকারি হাসপাতালে আসেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, এই দুটি প্রত্যাশার কোনোটাই বাস্তবায়িত হয় না, যা উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান।

একটি সার্থক স্বাস্থ্য সেবা (হেলথ কেয়ার সিস্টেম) তখনই পুরোপুরি কার্যকর হবে যখন স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিরাজমান নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির (যেমন, ডাক্তারদের অনুপস্থিতি, ঔষধপত্রের অপর্যাপ্ত সরবরাহ/অপচয় এবং অন্যান্য অব্যবস্থাপনা) অবসানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে। গ্রামের বিপুল জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেকই ভূমিহীন এবং বাকিদেরও এক বিরাট অংশ দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করেন। ফলে বিজ্ঞান ও ঔষধ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে চমকপ্রদ সব আবিষ্কার হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে লাখ লাখ লোক ন্যূনতম চিকিৎসা সুবিধা থেকে বঞ্চিত। দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, অশিক্ষা এবং সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিশৃঙ্খলা/অব্যবস্থার কারণে এই অব্যবস্থাপনার সিংহ ভাগই বহন করছেন গ্রামীণ জনগণ, বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠী নানা ধরনের হয়রানি ও বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন ।

আমাদের দেশে সরকারি হাসপাতালের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সেবার মান অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ের এবং সেবা পেতেও অনেক ধরনের নিয়ম বহির্ভূত খরচ করতে হয়। তাই অধিকাংশ লোক পারতপক্ষে সরকারি হাসপাতালের মুখাপেক্ষী হতে চান না। ফলে আমাদের দেশে পল্লী এলাকায় বেশির ভাগ মানুষের ভরসা প্রশিক্ষণহীন হাতুড়ে ডাক্তার, কবিরাজ, বৈদ্য এবং তেলপড়া, পানিপড়া, বা মোল্লা-পুরোহিতের ছু-মন্তরের ফুঁ। যখন অনন্যোপায় হয়ে তাদেরকে সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেতে হয় তখন আমরা কি দেখি? দিনের পর দিন বহির্বিভাগে রোগী ঘুরছে এক্সরে, রক্ত পরীক্ষার তারিখ পেতে, কেউ ঘুরছে অপারেশন তারিখের জন্য, কেউ বেডের জন্য, ঘুরতে ঘুরতে অনেকেরই পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে। হাসপাতালের পর্যাপ্ত শয্যার খুবই সংকট, এক শয্যায় দুজন রোগী এখন অতি পরিচিত দৃশ্য। এটা নিশ্চয়ই কাম্য নয়। এই বৈজ্ঞানিক, দ্রুত পরিবর্তনশীল যুগে আমাদের ঘুনে ধরা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অনুপযোগী। আমাদের দেশে হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট নীতি নেই, নেই কোনো বৈজ্ঞানিক ঔষধ নীতি এবং সমন্বিত মেডিকেল শিক্ষানীতি। "সকলের জন্য স্বাস্থ্য" এ বিষয়ে নানা আলোচনা চলছে সারা দেশ জুড়ে। বিভিন্ন লোকজন নানা ধরনের কথাবার্তা বলছেন। তারা বলছেন ব্যবস্থা নাকি এদেশে ভালোই হতে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের সমীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে এটা জোর দিয়ে বলা যায় যে, যদি আমরা বাংলাদেশে বিদ্যমান সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার করুণ অবস্থার দিকে তাকাই তাহলে "সকলের জন্য স্বাস্থ্য" শ্লোগানটি দিবা স্বপ্নের মতো মনে হবে।

ডাক্তার-নার্সদের প্রাপ্যতায় গ্রাম এবং শহর এলাকার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে, পল্লী এলাকায় যেখানে দেশের দু-তৃতীয়াংশ লোকের বাস সেখানে দেশের মোট ডাক্তারের ২০ শতাংশের কম বাস করেন। আরও পরিতাপের বিষয় এই যে, মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবার বেশির ভাগ সুবিধাই শহর কেন্দ্রিক। ফলে পল্লী এলাকার অধিকাংশ জনগণ যারা বিদ্যাহীন, বিত্তহীন ও দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করেন তারা মানসম্মত চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধার নাগাল পান না।

পর্যাপ্ত খাদ্য ও পুষ্টির অভাবে এবং অশিক্ষা ও অজ্ঞতার কারণে প্রান্তিক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী নানা রকম রোগ-ব্যাধিতে ভুগে থাকে। অতীতে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা সত্ত্বেও দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠির জন্য এখনও পর্যন্ত একটি সার্থক চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যায়নি। দেশের আপামর জনসাধারণের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থা করা কেবলমাত্র কাগজের মধ্যেই সীমিত। ফলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যারা দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে, বিশেষভাবে মা ও শিশু স্বাস্থ্যের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। কারণ স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাবে গরিবরা সহজেই নানা ব্যধিতে আক্রান্ত হয়, আবার তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও অত্যন্ত কম। পুন: পুন: রোগব্যধিতে আক্রান্ত হবার ফলে গরিবদের মধ্যে বিরাজমান পুষ্টিহীনতার আরও অবনতি ঘটে এবং অপুষ্টি-রোগব্যাধি-মৃত্যু এই দুষ্টচক্র অনবরত চলতেই থাকে।

৫। সমীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা

এই প্রবন্ধে যেসব তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে তার অধিকাংশই বিআইডিএস কর্তৃক পরিচালিত (২০১২-১৩) "বাংলাদেশে সরকারি খাতে প্রদত্ত সেবার মান নিরূপণ: প্রেক্ষাপট স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সুশাসন" শীর্ষক গবেষণা থেকে নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার দেশের আপামর জনগোষ্ঠীর কাছে স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে হাসপাতাল/স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। কিন্তু স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে অবকাঠামো উন্নয়নসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া সত্ত্বেও সেইসব কার্যক্রমের সর্বোচ্চ সুফল থেকে জনগোষ্ঠীর এক বৃহৎ অংশ এখনও বঞ্চিত। সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সেবার গুণগত মান ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত দুর্বলতার কারণে সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে জনগণের সেবা গ্রহণের মাত্রা এখনও অনেক কম। এমন এক প্রেক্ষাপটে বর্তমান গবেষণাটি সম্পন্ন হয়েছে। গবেষণা ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সেবা পেতে রোগীদের যে ধরনের ভোগান্তির শিকার হতে হয়, তার মধ্যে অন্যতম হলো: ঔষধপত্রের অপ্রতুল সরবরাহ, ডাক্তারের অনুপস্থিতি, রোগীকে যথেষ্ট সময় না দেয়া, নিম্ন মানের সেবা, হাসপাতালের স্টাফ কর্তৃক বাড়তি অর্থ দাবী/টাকা ছাড়া কোনো সেবা না পাওয়া, হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত দুর্বলতা, কার্যকর অডিট ব্যবস্থা ও তদারকির অভাব, বিদ্যমান আইন/নিয়ম পালনে অনীহা, জবাবদিহির অভাব, স্থানীয় পর্যায়ে নজরদারীর অভাব এবং মনিটরিং ও মূল্যায়নের অনুপস্থিতি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সরকারি হাসপাতলের সমস্যা একক কোনো সমস্যা নয়, বরং তা হলো অনেকগুলো পুঞ্জীভূত সমস্যার সমাহার। তাই একক বা বিচ্ছিন্ন কোনো সমাধান এই সমস্যার সুরাহা করতে পারবে না, বরং এর সমাধানে প্রয়োজন সমন্বিত প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ । হাসপাতালের অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার অন্যতম কারণ হলো কার্যকর তদারকি ব্যবস্থা ও নজরদারির অভাব এবং প্রচলিত আইন/বিধি-নিষেধ না মানার প্রবণতা। সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ওষুধ ও অন্যন্য দ্রব্যাদির অপচয়/অব্যবস্থাপনা, নিয়ম বহির্ভূত অর্থ গ্রহণ, ডাক্তারের অনুপস্থিতি, প্রাইভেট প্র্যাকটিস ইত্যাদি বিষয়গুলোও সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ব্যবহার ও প্রদত্ত সেবার মান দারুণভাবে ব্যাহত করছে।

স্বাস্থ্য খাতে যে নৈরাজ্য চলছে তা দূর করার জন্য ২০০৯ সালে ২১ সদস্য বিশিষ্ট "জেলা হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটি" নামে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এতে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত আছেন সংসদ সদস্য, জেলা প্রশাসক, সিটি মেয়র, সিভিল সার্জন, উপ-পরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা), হাসপাতালের নার্সদের প্রতিনিধি, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের প্রতিনিধি এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ। উপরোক্ত কমিটির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল মাসিক সভায় হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সমস্যা চিহ্নিত করা, সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে আলোচনা করা এবং সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, বেশির ভাগ জেলা হাসপাতালেই কমিটিগুলো কার্যকর ভূমিকা পালন করছে না এবং অধিকাংশ হাসপাতালেই মাসিক সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয় না। মাসিক সভার পরিবর্তে প্রতি তিন/চার মাস অন্তর সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সংসদ সদস্যসহ অনেকেই উক্ত সভায় উপস্থিত থাকেন না। সর্বোপরি, সভায় যে সমস্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয় কদাচিৎ সেগুলোর সমাধানে সময়োপযোগী কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

সুতরাং সমস্যা চিহ্নিতকরণের মধ্যেই কমিটির ভূমিকা সীমিত হয়ে পড়ে, সমস্যা নিরসনে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ বা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয় না।

দেশের সরকারি হাসপাতালগুলোতে অনিয়ম ও অব্যবস্থার কিছুতেই অবসান ঘটছে না। চিকিৎসার জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব রয়েছে প্রায় প্রতিটি হাসপাতালে। যে যন্ত্রপাতি রয়েছে তার বেশির ভাগই থাকে বিকল। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সাধারণ মানুষের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করতে একের পর এক হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হলেও সেবার গুণগত মান আশানুরূপ নয়। সরকারি হাসপাতালগুলোতে ধারণ ক্ষমতার চেয়ে অন্তত দ্বিগুণ রোগী ভর্তি থাকে। ফলে সদিচ্ছা থাকলেও চিকিৎসকদের পক্ষে প্রতিটি রোগীর প্রতি নজর দেওয়া সম্ভব হয় না। চিকিৎসা উপকরণের এবং ঔষধপত্রের অভাবেও রোগীরা কাঙ্ক্ষিত সেবা থেকে বঞ্চিত হয়। চিকিৎসা মানুষের অন্যতম মৌলিক মানবাধিকার। বাংলাদেশের সংবিধানেও এ অধিকারকে স্বীকার করা হয়েছে। সন্দেহ নেই স্বাধীনতার পর প্রতিটি সরকার চিকিৎসা খাতকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। বর্তমান সরকারের আমলে এ ব্যাপারটি যে বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে তা চোখে পড়ার মতো। তারপরও চিকিৎসা ক্ষেত্রে অব্যবস্থার শেষ নেই। অব্যবস্থাপনা প্রতিটি সরকারি হাসপাতালের অনুষঙ্গে পরিণত হয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যসেবার জন্য নেওয়া সরকারি পদক্ষেপগুলোর কাঙ্ক্ষিত সুফল পাওয়া যাচ্ছে না।

সরকারি হাসপাতালে সেবার মান বাড়াতে হলে পর্যাপ্ত বাজেটের ব্যবস্থা যেমন করতে হবে তেমনি এর সুষ্ঠু ব্যবহার এবং সুশাসনের উপরও নজর দিতে হবে। ঘুণে ধরা সরকারি হাসপাতালের এই বেহাল দশার 'সংস্কার' দরকার এবং এক্ষেত্রে সংসদ সদস্য/নীতি প্রণয়নকারী এবং স্থানীয় পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। যেহেতু আমাদের দেশে যারা রুগ্ন, পীড়িত তাদের বেশিরভাগই দরিদ্র, মহিলা এবং শিশু, সেহেতু স্বাস্থ্যকেন্দ্রে শৃঙ্খলা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা একটি পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ হতে বাধ্য। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় সমস্যাসমূহ কঠিন ও জটিল তাতে সন্দেহ নেই। তবু এই পুঞ্জিভূত সমস্যার সমাধানে ম্যাজিকের মতো কাজ করতে পারে এমন একটি চাবিকাঠি হলো স্বাস্থ্য সেবায় সুশাসন নিশ্চিত করা। তাই যত শীঘ্র এই অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থার অবসান ঘটে ততই আমাদের মঙ্গল।

হাসপাতাল সেবার মান সম্পর্কে জনসাধারণের মতামত খুব একটা উৎসাহব্যঞ্জক নয়। দলগত আলোচনায় যে ধরনের মতামত প্রতিফলিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: "সব ধরনের অসুখের জন্য একই ধরনের ঔষধ দেয়া হয়ে থাকে (যেমন কয়েকটি ট্যাবলেট)," "হাসপাতালসমূহে ঔষধের অভাব খুবই প্রকট," "ঔষধ/চিকিসা পাওয়ার জন্য বাড়তি খরচ করতে হয়" ইত্যাদি। শুধু যে হাসপাতালে সময়মতো ডাক্তার থাকে না তাই নয়, রোগীদের প্রতি ডাক্তারদের আচরণেও আন্তরিকতা/সহানুভূতির অভাব পরিলক্ষিত হয়। দলগত আলোচনায় বারে বারে যে বক্তব্যটি উঠে এসেছে তা হলো "অপেক্ষার পালার পর রোগী দেখতে ডাক্তারের তাড়াহুড়ো, ঔষধ হিসেবে কিছু সাধারণ ট্যাবলেট প্রদান, এবং তার পর ঘরে ফিরে আসা" এই হলো সরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রে বহির্বিভাগ সেবার চিত্র।

স্বাধীনতা উত্তর স্বাস্থ্যখাতে গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ, ডাক্তার-নার্সদের প্রশিক্ষণ এবং আনুষঙ্গিক খাতে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে বটে কিন্তু স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও জনস্বাস্থ্যের মানোন্নয়নে ইপ্সিত পরিবর্তন ঘটেনি। গ্রামীণ জনগণের নিকট ন্যূনতম প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ পৌঁছে দেয়া

বাংলাদেশ সরকারের ঘোষিত স্বাস্থ্য নীতির মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে ওয়ার্ড, ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ এবং পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসা সেবাকে পণ্য হিসেবে গ্রহণ করায় মানুষ সঠিক সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মানব সেবার মহান ব্রত চিকিৎসা সেবাকে বাংলাদেশে পণ্য হিসেবে নেওয়া হচ্ছে। সেবার চেয়ে ব্যবসাকেই প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে, যে কারণে জনগণ মানসম্পন্ন চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। চিকিৎসা যদি পণ্য হয়ে যায়, তখন তার গুণগত মান থাকে না। সরকারি হাসপাতালে রোগীদের সেবা নিশ্চিত করতে ডাক্তার-নার্সদের যেমন মানবিক হওয়া উচিত, তেমনি হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য স্টাফদেরও রোগী-বান্ধব দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে হবে।

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করা আশু জরুরি:

- স্বাস্থ্য সেবার গুণগত মান উন্নয়ন
- স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমে জড়িত ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মীদের আচরণ/দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন
- সেবাপ্রদানকারী ডাক্তারদের চিকিৎসা কেন্দ্রে উপস্থিতি নিশ্চিত করা
- জরুরি ঔষধ ও চিকিৎসার উপকরণসমূহ সরবরাহ করা এবং এর অপচয় রোধ করা
- স্বাস্থ্য পরিচর্যা ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দ করা
- নিয়ম বহির্ভূত খরচ ও রোগীদের হয়রানি বন্ধে শৃঙ্খলাজনিত কার্যক্রম কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সুশাসন নিশ্চিত করা এবং বিরাজমান নৈরাজ্যের অবসান কল্পে সংসদ সদস্য, নীতিনির্ধারক, সুশীল সমাজ ও স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি সবাইকে একসঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে। তবে সর্বাগ্রে প্রয়োজন তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের সম্পৃক্ততা ও সচেতনতা বৃদ্ধি। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে, সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যে অনিয়ম ও নৈরাজ্য চলছে তার সমাধানে সমন্বিত কোনো ব্যবস্থা এখনও গ্রহণ করা হয়নি।

সাধারণ জনগণের স্বার্থের কথা চিন্তা করে জনপ্রতিনিধিদেরকে এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। বাংলাদেশের কৃষক, শ্রমিক, খেটে খাওয়া মানুষ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নে সংসদ সদস্য ও জনপ্রতিনিধিদের আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। তাদেরকে ভাবতে হবে জনগণের দুঃখ-দুর্দশা ও করদাতাদের রক্তজল করা টাকার কথা। স্বাস্থ্য খাতে যে নৈরাজ্য চলছে যেমন সময়মতো ডাক্তার থাকে না, প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র পাওয়া যায় না, এবং নির্ধারিত ফি এর বাইরে টাকা-পয়সা খরচ করতে হয় এ ব্যাপারে সংসদ সদস্যদের, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের ও সচেতন নাগরিকদের সোচ্চার হতে হবে এবং মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বাস্থ্য সেবার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে।

স্বাস্থ্যখাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সংসদ সদস্য/জনপ্রতিনিধি/নীতি নির্ধারকদের ভূমিকা

স্বাস্থ্য খাতে যে নৈরাজ্য চলছে তা প্রতিরোধে এবং স্বাস্থ্যখাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সংসদ সদস্য ও জনপ্রতিনিধিবৃন্দ নিম্নে বর্ণিত দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

১) সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ভূমিকাকে শক্তিশালী করা

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সংসদ সদস্যগণ জনগণের চাহিদাগুলো সংসদে উত্থাপন করতে পারেন। স্বাস্থ্যখাতে বিদ্যমান বিভিন্ন অনিয়ম যেমন- সেবাদানকারীদের অনুপস্থিতি, নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ গ্রহণ এবং অপর্যাপ্ত ঔষধ সরবরাহ ইত্যাদি বিষয় স্ট্যান্ডিং কমিটিতে প্রচলিত আইন/পলিসি পর্যালোচনার মাধ্যমে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় আইন/এ্যাক্ট তৈরি করতে পারেন এবং স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সরকারের কাছে সক্রিয় ও জোরালোভাবে সুপারিশসমূহ তুলে ধরতে পারেন।

২) জনমত সম্পৃক্তকরণ

- সংসদ সদস্য/জনপ্রতিনিধিরা এলাকার জনগণের মতামত/পরামর্শ গ্রহণ করে স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়নে বাস্তবমুখী পদক্ষেপের সুপারিশ করতে পারেন।
- দলমত নির্বিশেষে এলাকার সর্বস্তরের জনগণের সাথে সভা/বৈঠক করার মাধ্যমে সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সেবা পেতে জনগণের ভোগান্তির এবং অভিযোগ সম্পর্কে মতামত গ্রহণ করতে পারেন ।
- স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিদ্যমান অব্যবস্থাপনা দূরীকরণে জনগণের পরামর্শের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। যেমন, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেন সময়মত ডাক্তার থাকেন, প্রয়োজনীয় ঔষধপত্রের যাতে ঘাটতি না হয় সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং রোগীরা যাতে মানসম্মত চিকিৎসা সেবা পায় তা নিশ্চিত করা।

৩) সেবা প্রদানকারীদের কাজের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সুষ্ঠু তদারকি ও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা প্রচলনে সংসদ সদস্য/জনপ্রতিনিধি/ নীতি প্রণয়ণকারীবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। সমগ্র চিকিৎসা ব্যবস্থায় জবাবদিহিমূলক কাঠামো প্রচলন এবং একটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ তদারকি ব্যবস্থা প্রণয়নের নিমিত্তে সংসদ সদস্য/জনপ্রতিনিধি/নীতি নির্ধারকবৃন্দ নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন:

- স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা সম্পর্কে যেমন, ডাক্তারের অনুপস্থিতি, ঔষধপত্রের অপর্যাপ্ত সরবরাহ ইত্যাদি বিষয়ে স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা, আলোচনা সভার আয়োজন করা এবং এসব সমস্যা নিরসনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সুশাসন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে চাপ প্রদানকারী গ্রুপ হিসেবে ভূমিকা রাখা এবং জনগণের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বাজেট বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা।
- বিশেষ করে দরিদ্র, অসহায় এবং দুর্বলতর জনগোষ্ঠী যাতে সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা পান সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৪) স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলো সক্রিয় করা

জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে বিদ্যমান কমিটিগুলো সক্রিয় করার মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থাপনা ও তদারকি ব্যবস্থায় জনপ্রনিধিদের (উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, ইউপি চেয়ারম্যান) বেশি করে সম্পৃক্ত করা। স্থানীয় পর্যায়ের কমিটিগুলোকে আরও কার্যকর করার পদক্ষেপ নিতে হবে। সংসদ সদস্য/নীতি নির্ধারকবৃন্দ জেলা-উপজেলা-ইউনিয়ন পর্যায়ে কমিটিগুলোর সাথে আলোচনার মাধ্যমে বিদ্যমান অব্যবস্থাপনা/অন্তরায়গুলো চিহ্নিত করে তা দূরীকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন।

সুপারিশমালা

স্বাস্থ্য খাতে বিরাজমান সমস্যা সমাধানে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য গুরুত্বপূর্ণ করণীয় হলো:

- আমাদের দেশে মেডিকেল বোর্ড আছে। মেডিকেল বোর্ডের একটি টিম নিয়মিত বিভিন্ন হাসপাতাল পরিদর্শন করতে পারেন। নিয়মিত মনিটরিং করা হলে হাসপাতালের ডাক্তার-নার্স ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের জানা থাকবে যে তারা একটি মনিটরিং এর মধ্যে আছেন। ফলে তারাও ভয়ে ভয়ে থাকবেন এবং অনিয়ম-দুর্নীতির মাত্রা যথেষ্ট হ্রাস পাবে। এছাড়া একটি হটলাইনও খোলা দরকার। সেখানে যে কেউ অভিযোগ করলেই তার তদন্ত করা উচিত।

- আমাদের দেশে আইনের সঠিক প্রয়োগ নেই। অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে সাধারণত কোনো ডাক্তারকে শাস্তি দেয়া হয় না। কারণ শাস্তি দিতে গেলে সারাদেশে হরতাল হয়, রোগীদের চিকিৎসা বন্ধ করে দেয়া হয়। তাই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারকে আরও কঠোর হতে হবে। বিদ্যমান আইনের সঠিক প্রয়োগ না থাকায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অনিয়ম-দুর্নীতি ফ্রি স্টাইলে চলছে। এ অব্যবস্থাপনা কিছুতেই চলতে দেয়া যায় না। দেশের স্বার্থে, জনগণের কল্যাণে এবং সর্বোপরি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চিকিৎসা সেবার কথা চিন্তা করে সরকারি হাসপাতালে ঔষধপত্রের অপচয়/কালোবাজারি এবং ডাক্তার-নার্সের অনুপস্থিতি ইত্যাদি বিষয়গুলো প্রতিহত করতে হবে। সরকারকে বিদ্যমান আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রয়োজনে "হাসপাতালে দুর্নীতি/অনিয়ম রোধ সংক্রান্ত" নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে।

উপরোল্লিখিত করণীয়গুলো ছাড়াও নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে:

- জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে বিদ্যমান স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কমিটিগুলোর নিয়মিত সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা এবং এদের কার্যক্রম আরও গতিশীল করা।

- স্বাস্থ্যসেবার পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও তদারকি ব্যবস্থায় জনপ্রতিনিধিদের যেমন- সংসদ সদস্য, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান/ভাইস-চেয়ারম্যানদের সক্রিয় অংশগ্রহণ।

- একটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ তদারকি ব্যবস্থা প্রণয়ন।

অধিকন্তু সংসদ সদস্য, নীতি প্রণয়ণকারী এবং নির্বাচিত স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা নিম্নলিখিত বিষয়ে বিশেষ দায়িত্ব পালন করতে পারেন:

- ডাক্তার/সেবা প্রদানকারীদেরকে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করার জন্য তাদের সাথে নিয়মিত সভা করা/বৈঠকে বসা।
- অঘোষিত পরিদর্শনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তারদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ এবং মান সম্মত চিকিৎসা সেবা প্রদানে উদ্বুদ্ধ করা।
- শ্রেণী, বর্ণ নির্বিশেষে রোগীদের প্রতি মানবিক দায়িত্ব সম্বন্ধে চিকিৎসকদের সচেতন করে তোলা এবং রোগীদের পর্যাপ্ত সময় নিয়ে ও যত্ন সহকারে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা।
- কোনো সেবাপ্রদানকারীর ক্ষেত্রে দায়িত্বে অবহেলা অথবা অনুপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া গেলে প্রয়োজনীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে বিদ্যমান স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কমিটিগুলোর নিয়মিত সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা এবং এদের কার্যক্রম আরও গতিশীল করা।
- স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ঔষধ ও অন্যান্য চিকিৎসা সরঞ্জামাদি নিয়মিত তদারকির মাধ্যমে সেসবের মজুদ নিয়ন্ত্রণ করা, যাতে করে অপচয়/অপব্যবহার রোধ করা যায়।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে সেবাপ্রদানকারী এবং নীতিনির্ধারকদের নিশ্চিত করতে হবে যাতে করে যথাযথ স্বাস্থ্য সেবা সঠিক সময়ে সঠিক লোকদের কাছে পৌঁছায়। শুধু সেবা প্রদান করলেই হবে না, একই সাথে জনগণ যাতে স্বল্প খরচে মানসম্মত চিকিৎসা সেবা পায় সেটাও নিশ্চিত করতে হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

Ara, Ferdous (2008): "Key Issues to Health Governance in Bangladesh," paper presented to the International Conference on 'Challenges of Governance in South Asia' held in Kathmandu, Nepal, December 15-16.

Begum, Tahmina et al. (2001): *Who Benefits from Public Health Expenditure?* Research Paper 22, MoHFW.

BIDS (2013): *Public Service Delivery Systems in Bangladesh: Governance Issues in the Health Sector*, Report submitted to the Asia Foundation.

Chaudhury, N. and J. Hammer (2003): "Ghost Doctors: Absenteeism in Bangladeshi Health Centers," World Bank Policy Research Working Paper 3065, World Bank, Washington, DC.

CIET Canada and MoHFW (2001): *Service Delivery Survey: Second Cycle, 2000*, CIET Canada and Ministry of Health and Family Welfare, GoB.

Euro Health/World Bank (2004): *Drug Management, Extent of Unofficial Fees and Staff Absenteeism at Five Selected Hospitals in Bangladesh*, Final Report on Bangladesh Governance Study, conducted by Euro Health Group.

Khan, M. R. (ed) (1988): *Evaluation of Primary Health Care and Family Planning Facilitis and their Limitations Specially in the Rural Areas of Bangladesh*, BIDS Research Monograph No.7.

Mannan, M. A. et al. (2003): *Public Health Services Utilization Study*, report submitted to HEU (Health Economics Unit), Ministry of Health and Family Welfare.

Mannan, M. A. and S. R.Howlader (2004): *Productivity and Cost of Public Health Services in Bangladesh*, report submitted to Maxwell Stamp PLC/DFID.

MoHFW, GoB (1997): *Unofficial Fees at Health Care Facilities in Bangladesh: Price, Equity and Institutional Issues.*

Osman, F. A. (2004): *Policy Making in Bangladesh: A Study of the Health Policy Process*. Bangladesh: A H Development Publishing House.

Osmani, S. R. (2002): "Expanding Voice and Accountability through the Budgetary Process," *Journal of Human Development,* 3 (2):231-250.

WHO (2003): "Study on Improving Access to Health Care for the Poor and Vulnerable in Bangladesh," (mimeo), Dhaka: World Health Organization.